প্রবন্ধ রত্ন।

অর্থাৎ।

ব্রাহ্মণ, স্ত্রীচরিত্র, ব্রজলীলা, সত্যযুগের আবি-
র্ভাব, ঘোমটা, সৌন্দর্য্য, বঙ্গীয় নাট্যশালা,
নারী জন্ম, চৈতন্য কি পূর্ণব্রহ্ম
প্রভৃতির একত্র সমাবেশ।

শ্রীজটাধারী শর্ম্মা কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত
ও পরিবর্দ্ধিত।

কলিকাতা,

২১০/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত এবং কৃষ্ণনগর নিবাসী
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১২৯১

মূল্য ৷৹ আনা।

বিজ্ঞাপন।

রত্নের অধিকাংশ প্রবন্ধ পূর্ব্বে মাসিক সমালোচক, মুকুলমালা, আর্য্য-দর্শন, বান্ধব প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এক কোণে পড়িয়া ছিল। রত্নের অপব্যবহার আমার নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় আমি ঐ ঐ প্রবন্ধ গুলি পরিবর্ত্তিত ও পরি-বর্দ্ধিত করতঃ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। ইহার প্রশংসার ভাগী আমি নহি। দোষ টুকু আমার স্কন্ধে চাপাইয়া পাঠকগণ বিশ্রাম করিবেন।

প্রবন্ধ রত্ন কোনও অংশেই পঞ্চানন্দ ও পাঁচু ঠাকুর হইতে ন্যূন নহে, ইহার হৃদয় বিদারী বিদ্রূপ, কূট-শ্লেষ, অগ্নিময়—উপহাস এবং বক্রোক্তি প্রভৃতি ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় অন্তর্ভেদে সমর্থ। হাসিতে, হাসা-ইতে, ঠাট্টা করিতে ও মধ্যে মধ্যে মেঘান্তরিত রৌদ্রবৎ গালি বর্ষণে খুব মজবুত। ইহার হাত কেহই ছাড়াইতে পারিবেন না। যিনি যখন পড়িবেন তিনিই তখন মনে মনে পুরস্কার দিবেন। ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করা হয় নাই, তবে যদি কেহ ঘরে কে—"আমি কলা খাইনা"র মত নকল দাঁত বাহির কল্লে শুক্‌ন হাসি হেসে মিটমিটে ডাইনের মত আসিয়া আসরে আপনি জাহির হইয়া পড়েন তবে অমি নাচার।

পাঠিকাগণ, তোমাদেরে কিন্তু খুব বাড়াইয়াছি, মনের সহিত ভক্তিও করি। মনে রেখ, আজের বাজারে আমি না ওয়ারিশ হইয়া ওয়ারিশী মাল লইয়া তোমাদের দ্বারস্থ হইলাম, যদি কেহ তাড়া দেয় তবে আমার হইয়া একটা কথা বলিও। ইহাই আবদার।

উপরোক্ত পত্রিকাগুলির সম্পাদক মহাশয়দিগের নিকটে বিনীত-ভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

শ্রীজটাধারী শৰ্ম্মা।

পুস্তক পাইবেন—চুঁচড়া পোষ্ট, হুগলী ঠিকানায়।

প্রণয়োপহার।

যিনি সংসারে,—
কোজাগরের চাঁদ, ধর্ম্মে—সহ-
ধর্ম্মিণী, জগতে—সর্ব্বস্ব, পর জগতে—
সঙ্গিনী, মায়ায়—মোহ, সেই হৃদয় উদ্যানের
প্রাণরূপিণী শ্রীমতী পবিত্রময়ী দেবীর কর
কমলে স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ
এই রত্ন অর্পিত হইল।

প্রবন্ধ-রত্ন।

ভারতে ব্রাহ্মণ ও জাতিভেদ।

"বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।"

ভাগ্য-দেবের চিত্রপটে ভারতের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ তাহার একটী প্রধান অঙ্গ। এই চিত্রের ছায়া ও বর্ণপ্রভার এক মাত্র মূল ব্রাহ্মণ জাতি, ইহা তিরোহিত হইলে চিত্রের মাধুরীও বিলুপ্ত হইবে। ভাগ্য-পটে ভারত চিত্রের মাধুরীতে দর্শকের আনন্দাশ্রু প্রবাহিত না হইয়া বরঞ্চ শোকপ্রস্রবণ উপলিয়া উঠে। ভারত এখন শ্মশান। যদি কোন চিত্রকর শ্মশানের সলিল-ধৌত সৈকতে শোকাকুল-বান্ধববেষ্টিত শব, অদূরসজ্জিত চিতা, ভগ্নহৃদয় ধরণীলুণ্ঠিত অগ্নিদানোন্মুখ পুত্র, শ্মশানের সেই হৃদয়ভেদী প্রতিমূর্ত্তি, লোকের চক্ষুর সমীপে তাঁহার কালজয়ী তুলিকা বলে উপস্থিত করিতে পারেন, তাঁহার চিত্র যে মাধুরীহীন, একথা কেহই বলিবেন না, তবে এ মাধুরী বিকট, মর্ম্মভেদী,—আনন্দপ্রদ নহে।

ভারতের যে উন্নতি হইয়াছিল, তাহার মূল একমাত্র ব্রাহ্মণ। যদি ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত থাকিত, যদি কোন ঋষি বিজন অরণ্যে বসিয়া আমাদের অবগতির জন্য ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, অভ্যুদয় ও অবনতির কাহিনী পুস্তকবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে আমরা দেখিতাম যে ব্রাহ্মণের সহিত ভারতবাসী আর্য্য জাতির উন্নতি ও অবনতির কত নিকট সম্বন্ধ। পুরাবৃত্তের উপকরণ যে হিন্দু জাতির ছিল না, তাহা কেহই বলিবে না।

ভারতবর্ষে একমাত্র যে জাতি ভারত-পুরাবৃত্ত লিখিবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই পুরাবৃত্তের প্রতি উদাসীন ছিলেন। ব্রাহ্মণ পার্থিব বিষয়ে আস্থাশূন্য। এই ভব সাগরের যে জল-বুদ্-বুদ্ উঠিয়া সাগরবক্ষে মিশিয়াছে, তাহার ত কথাই নাই; যাহা সৌর-কিরণে রঞ্জিত হইয়া লহরী লীলায় নাচিয়া বেড়াইত, তাহাও ব্রাহ্মণ দেখিতেন না, অতীত অথবা বর্ত্তমানের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না। ব্রাহ্মণ বিশেষ রূপে জানিতেন, যে এই পৃথিবী তাঁহার বাসস্থান নহে, তিনি কালের অনন্ত পথের পথিক, ভব-পান্থশালায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, রজনী প্রভাত হইলেই গন্তব্য পথে প্রস্থান করিবেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ পান্থশালার গোলযোগে মিশিতেন না। যাহার সহিত পারকালিক ভবিষ্যতের কোন সম্পর্ক নাই, যাহার অনুধাবনে তাঁহার মোক্ষ প্রাপ্তির সাহায্য হওয়া দূরে থাকুক্, বরং তাঁহার অনিষ্ট হইবে, তাহা ব্রাহ্মণের বিশ্বাস মতে ত্যজ্য। হিন্দু জাতির যে গ্রন্থ পাঠ করিবে, তাহাতেই ইহার শত শত দৃষ্টান্ত পাইবে। আধুনিক বাঙ্গালি হয়ত নাসাগ্র কুঞ্চিত করিয়া বলিবেন "আমরা অসার উপন্যাসে বিশ্বাস করি না।" আমরা তাঁহাদিগকে বলি যে, উপন্যাস অসার হইতে পারে, বিশ্বাস করিও না; কিন্তু উপন্যাস হইতে তদ্বর্ণিত লোক ও কালের মনোভাব ও অবস্থা বোধগম্য হয় না কি? যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে,—

ঋত্বিগ্‌ভ্যো হি দদৌ রাজা ধরাং তাং কুল বর্দ্ধনঃ।
ঋত্বিজস্ত্বব্রুবন্ সর্ব্বে রাজানং গত কিল্মিষং।
ভবানেব মহীং কৃৎস্নামেকো রক্ষিতুমর্হতি।
ন ভূম্যা কার্য্যমস্মাকং নহি শক্তাঃ স্ম পালনে॥
রতাঃ স্বাধ্যায় করণে বয়ং নিত্যং হি ভূমিপ।
নিষ্ক্রয়ং কিঞ্চিদেবেহ প্রযচ্ছতু ভবানিতি॥

মণিরত্নং সুবর্ণং বা গাবো যদ্বা সমুদ্যতং।
তৎপ্রযচ্ছ নৃপশ্রেষ্ঠ ধরণ্যা ন প্রয়োজনং॥

যে ধরণীর জীব নহে, তাহার ধরণী লইয়া কি প্রয়োজন? সে মহা ফাঁপরে পড়িয়া বলিল, রাজন্ আমি পৃথিবী পালন করিতে পারিব না, আপনি আমাকে তদ্বিনিময়ে যাহা কিছু উপস্থিত আছে দান করুন্, পৃথিবী আপনারই শাস্তা, আমি পৃথিবী লইব না। ইহা উপন্যাস হইতে পারে, কিন্তু এই উপন্যাস হইতে যিনি অন্য কোন সার সংগ্রহ করিতে না পারেন, তিনি কৃপাপাত্র—অতি দীন।

ব্রাহ্মণ পার্থিব সমুদয় পদার্থকে নশ্বর বলিয়া জানিতেন। কেবল জানিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, সেই বিশ্বাস মত কার্য্য করিতেন। তুমি আমি অনেক বিষয় সত্য বলিয়া জানি, কিন্তু তদনুসারে কার্য্য করি না। করিলে, নিঃসন্দেহ এই পৃথিবীতে মহা গণ্ডগোল বাধাইতে পারিতাম। যাহার সহিত অনাদি অনন্তের কোন সম্বন্ধ নাই, যাহা কেবল নশ্বর ও পার্থিব মাত্র, যাহাতে ব্রাহ্মণের সুগভীর ভক্তি সমুদ্র আমূল আন্দোলিত করিয়া উত্তাল তরঙ্গে অন্যান্য মনোবৃত্তি প্লাবিত ও অকর্ম্মণ্য করিতে না পারিত, তৎপ্রতি তাঁহার মনোভিনিবেশ হইত না। যদ্দ্বারা ব্রাহ্মণের ইন্দ্রিয়-সংযম ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি চরিতার্থতার কোন সাহায্য না হইত, তৎপ্রতি ব্রাহ্মণ উদাসীন। তিনি দূর তপোবনে শিখরচ্যুতকলনাদিনির্ঝরধৌত যোজন-ব্যাপী তরুমূলে মুদিতনেত্রে অগম্য অপার পুরুষের ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন, লোকালয়ের ঘটনা তাঁহার অনুসন্ধেয় ছিল না। এই কারণে ব্রাহ্মণ প্রাচীন জাতিগণের মধ্যে চিন্তাশীলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। আধুনিক সভ্য সমাজে যে সকল বিষয় এখন মনীষিতার সর্ব্বোচ্চ পরিচয় স্থল, এমন পুরাবৃত্তে ব্রাহ্মণের দৃষ্টি কোন কালেই পতিত হয় নাই; সুতরাং সেখানে কেবল মাত্র মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে, যে দিকে চক্ষু ফিরাও দেখিবে, শুষ্ক বালুকারাশি, ও গভীর অন্ধকারময় কূপ, বিন্দু মাত্র জল নাই।

মানুষ স্বভাবতঃ ভক্তিপরায়ণ। ভক্তি বৃত্তির চরম সীমা ঈশ্বর—মধ্যে অনেক গুলি ক্ষুদ্র বিভাগ আছে। মানুষ এই মনোবৃত্তির দাস। তিনি চার্ব্বাক দর্শন, সাংখ্য দর্শন ও ভারতীয় সমুদয় দর্শন পাঠ করিয়া হয় ত স্থির করিয়াছেন, যে তিনি নাস্তিক, বিশ্বের বৈচিত্র এবং মহান্ ভাব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার মানসে ভক্তির তরঙ্গ উঠে না; ধর্ম্ম সংস্পৃষ্ট কোন বিষয় দ্বারা তাঁহার হৃদয় রূপ প্রশান্ত মহাসাগর কখন আন্দোলিত হয় না; যে ঘটনায় সমাজের সুগভীর তলস্থ বারিরাশি উচ্ছলিত হইয়া উঠে, তদ্দর্শনে তাঁহার নাসাগ্র কুঞ্চিত হইয়া ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাস্যের আবির্ভাব হয়,—যিনি মনে মনে আপনাকে এ প্রকার মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তিনি বাস্তবিক মহাপুরুষ নহেন। তিনি অতি ক্ষুদ্র পুরুষ।

সাধারণত ভক্তি বলিলেই ঈশ্বরভক্তি বুঝায়। যিনি এই সুবিশাল বিশ্বে কেবল মাত্র স্রষ্টার কৌশল, করুণা ও মহিমা দেখেন, ও তদ্দর্শনে পুলকিত চিত্তে তাঁহার প্রেমসাগরে ক্রমশঃ নিমগ্ন হইতে থাকেন, লোকের নিকট তিনিই ভক্ত বলিয়া পরিচিত। যে মনোবৃত্তি তৃপ্তির জন্য চৈতন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, যাহার উত্তেজনায় য়ীহুদাদেশে মহর্ষি ঈশা জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল এক মাত্র ঈশ্বরে আবদ্ধ নহে। এই ভক্তি তরুর শাখানিচয় যেমন ঊর্দ্ধে গগনভেদ করিয়া উঠিয়াছে, তেমনি ইহার মূল সকল মানব সমাজের গূঢ়তম স্থলে প্রবেশ করিয়াছে।

আমি যদি তোমাকে ভক্তি করি, তোমার পুত্র পৌত্রের প্রতিও আমার ভক্তি জন্মিবে,—পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু ভক্তি জন্মিবে। যে যে দেশে জাতিভেদ প্রথা ছিল, সেই সেই দেশেই এই কৌতূহলজনক ঘটনা দেখিতে পাইবে।

ভারতবর্ষের জাতিভেদ যে এই প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিমূলক, তাহা মহাভারত লেখক বোধ হয় অবগত ছিলেন,—তাঁহার সর্ব্বত্র প্রসা-

রিণী বুদ্ধিশক্তি যে বর্ণবিভেদের গূঢ়তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছিল, নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক সকল তাহার প্রমাণ। মহর্ষি ভৃগু ভরদ্বাজকে বলিলেন যে,

ব্রাহ্মণানাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়ানাঞ্চ লোহিতঃ।
বৈশ্যানাং পীতকোবর্ণঃ শূদ্রানামসিতস্তথা॥

"ব্রাহ্মণগনের শুভ্রবর্ণ, ক্ষত্রিয়গণের লোহিত বর্ণ, বৈশ্যগণের পীতবর্ণ এবং শূদ্রগণের কৃষ্ণবর্ণ।" ভৃগুবাক্যে ভরদ্বাজের সন্দেহ উপস্থিত হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

চাতুর্বর্ণ্যস্থ বর্ণেন যদি বর্ণোবিধিয়তে।
সর্ব্বেষাং খলু বর্ণানাং দৃশ্যতে বর্ণশঙ্করঃ॥
কামঃ ক্রোধঃ ভয়ং লোভ শোকশ্চিন্তা ক্ষুধাশ্রমঃ।
সর্ব্বেষাং নঃ প্রভবতি কস্মাদ্‌বর্ণো বিধিয়তে॥
স্বেদমূত্র পুরীষাণি শ্লেস্মাপিত্তং সশোণিতং।
তনু ক্ষরতি সর্ব্বেষাং কস্মাদ্ বর্ণো বিধিয়তে॥
জঙ্গমানামসংখ্যেয়াঃ স্থাবরানাঞ্চ জাতয়ঃ।
তেষাং বিবিধ বর্ণানাং কুতো বর্ণবিনিশ্চয়ঃ॥

চাতুর্বর্ণ্যগণের বর্ণানুসারে যদি জাতিবিধান হয়; তাহা হইলে সকল বর্ণগণের বর্ণশঙ্কর নিশ্চিত দৃষ্ট হইতেছে। কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা, শ্রম আমাদের সকলের উপরেই প্রভুত্ব করিয়া থাকে, তবে বর্ণবিভেদ কি প্রকারে হইল? স্বেদ, মুত্র, মল, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও শোণিত সকলের পক্ষে সাধারণ, এবং সকলেরই দেহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; তবে বর্ণবিধান কি প্রকারে হইল? অসংখ্য স্থাবর জঙ্গম জাতি সকল দৃষ্ট হয়, সেই বিবিধ জাতিদিগের জাতিনির্ণয় কিরূপে সাধিত হইবে?

ভরদ্বাজের চিত্ত বাস্তবিকই সন্দেহাকুল হইয়াছিল। বর্ণ অনুসারে

জাতিভেদ করিতে হইলে; তিনি দেখিলেন, কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না, কারণ তাঁহার সময়ে অনেক ব্রাহ্মণ শ্বেতকায় ছিলেন না, হীনজাতিগণের ন্যায় নানা বর্ণ বিশিষ্ট ছিলেন। মহর্ষি ভৃগু উত্তর করিলেন

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পুর্ব্বং সৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতং॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণা ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গা স্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্ব কর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্মো যজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিসিধ্যতে॥
ইত্যেতে চতুরোবর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী।
বিহিতা ব্রহ্মণা পূর্ব্বং লোভাত্ত্বজ্ঞানতাং গতাঃ॥

"জাতি বিভেদ নাই। ব্রহ্মা কর্তৃক এই সমস্ত জগৎ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণময় সৃষ্ট হইয়াছিল, পরে কর্ম্ম দ্বারা বর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণগণ কামভোগপ্রিয়, উগ্র ও ক্রোধযুক্ত, সাহসী, স্বধর্ম্মত্যাগী এবং লোহিত দেহ, তাহারা ক্ষত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণগণ গাভিজাত দ্রব্যে জীবন নির্ব্বাহ করে, পীতবর্ণ, কৃষি উপজীবী ও স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, তাহারা বৈশ্যতা প্রাপ্ত হইল। যে ব্রাহ্মণগণ হিংসা এবং অসত্যপ্রিয়, লোভী, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, কৃষ্ণবর্ণ ও শুদ্ধাচার ভ্রষ্ট, তাহারা শূদ্রতা প্রাপ্ত হইল। এই রূপে কর্ম্ম দ্বারা

বিভিন্ন হইয়া দ্বিজগণ বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাদের ধর্ম্মাচরণ ও যজ্ঞ ক্রিয়াদি চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ হয় নাই। আমি এই চতুর্বর্ণের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, ব্রহ্মা পূর্ব্বে ইহাদের জন্য ব্রাহ্মী সরস্বতী বিধান করিয়াছিলেন, কিন্তু লোভবশত ইহারা অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হইয়াছে।”

মহর্ষি ভৃগু ব্রাহ্মণের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন, তাহার সহিত উপরোক্ত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কোন সাদৃশ্য নাই।

জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃত শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ষঠ্ স্বকর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥
শৌচাচারস্থিত সম্যগ্ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে।

যিনি জাতকর্ম্মাদি সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত এবং শুচি হইয়াছেন, যিনি বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ও ষড়কর্ম্মস্থিত, শৌচাচারী, যজ্ঞান্ন-ভোজী, গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতী এবং সত্যনিষ্ঠ, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়।

আর্য্য-সমাজের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি উপরোক্ত গুণসম্পন্ন নহেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র নামে অভিহিত হইলেন। ভৃগুর মতে ইহারা সকলেই “ত্যক্তস্বধর্ম্মা” কিম্বা “স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি”। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণেরও কোন উল্লেখ নাই, এবং “কাম-ভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণা” ও “হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধা” ইত্যাদি যে সকল গুণের নির্দ্দেশ হইয়াছে, তাহা বুদ্ধিবৃত্তির নিকৃষ্টতার পরিচায়ক। বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতিবৃত্তি যে সমগতি বিশিষ্ট ও এই সমগতি যে প্রকৃত উন্নতির একমাত্র সংসাধক, তাহা বলা বাহুল্য।

ভারতবর্ষের চাতুর্বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাতন ঋষিগণের কি প্রকার বিশ্বাস ছিল, তাহা সকলেই জানেন। তাঁহাদের মতে প্রজা-

পতি ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু এবং পাদ হইতে ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের সৃষ্টি হইয়াছে। মহাভারতলেখক প্রভৃতির ন্যায় যাঁহারা বর্ণবিভেদের গূঢ় তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহাদের মত লোকসমাজে প্রচারিত হয় নাই, সাধারণ হিন্দু ব্রহ্মার অঙ্গচতুষ্টয় চতুর্বর্ণের উৎপত্তি স্থান বলিয়া বিশ্বাস করেন। আমরা বর্ণোৎপত্তি সম্বন্ধে বৈদিক প্রমাণও উদ্ধৃত করিলাম।

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০ম সূক্তের ১ম ঋকের নাম পুরুষসূক্ত, এবং এই সূক্তে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি প্রক্রিয়া কথিত হইয়াছে। আমরা সমুদায় ঋকৃটি উদ্ধৃত করিলাম।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যষ্ঠিদ্দশাঙ্গুলং ॥ ১
পুরুষঃ এবেদং সর্ব্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভাব্যং।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২
এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥৩
ত্রিপাদুর্দ্ধোদৈত পুরুষঃ পাদোঽসেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিশ্বং ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥ ৪
তস্মাদ্‌ বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্‌ ভূমিমথো পুরঃ।
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবাঃ যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্মং ইধ্মঃ শরদ্‌ হবিঃ ॥ ৬
তং যজ্ঞং বর্হিষি পৌক্ষন্‌ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবাঃ যাজন্ত সাধ্যায়ঃ ঋষয়াশ্চ যে ॥ ৭

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যং।
পশূন্ তংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাংশ্চ যে ॥ ৮
তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
চ্ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৯
তস্মাদশ্বা জায়ন্ত যেকেচোভয়াদতঃ।
গাবোহ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজাতাঃ অজাবয়ঃ ॥ ১০
যৎ পুরুষং ব্যদধূঃ কতিধাবি অকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কোরুপাদোচ্যতে ॥ ১১
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১২
চন্দ্রমা মনসো জাত শ্চক্ষোঃ সূর্য্যোঃ অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্ বায়রজায়ত ॥ ১৩
নাভ্যাং আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্ততঃ।
পদভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোতাৎ তথা লোকানকল্পয়ন্॥ ১৪
সপ্তাস্যাসন্ পরিধয় স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবাঃ যদ্ যজ্ঞং তন্বানাঃ অবধ্নান্ পুরুষং পশুং ॥ ১৫
যজ্ঞেন যজ্ঞ মযাজন্ত দেবা।
স্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমানি আসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত
যত্র পূর্ব্বে সাধ্যায়ঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬

পুরুষ সহস্রশীর্ষ, সহস্রচক্ষু ও সহস্রপাদ। তিনি এই পৃথিবী সর্ব্বত্র আবরণ পূর্ব্বক দশাঙ্গুলব্যাপ্ত স্থান দ্বারা ব্যাপিয়া রাখিয়াছেন।

পুরুষই এই সমস্ত বিশ্ব, ভূত ভাবী সমস্তই পুরুষ, এবং তিনি অমৃতত্বের ঈশ্বর, যে হেতু তিনি অন্নদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। তাঁহার মহিমা এই প্রকার, এবং পুরুষ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই ভূতগণ তাঁহার চতুর্থাংশ মাত্র, অবশিষ্ট তিনভাগ স্বর্গে, অমৃতরূপে বিরাজ করিতেছে। পুরুষ ত্রিপাদ সহ ঊর্দ্ধে গমন করিলেন, তাঁহার চতুর্থাংশ এই পৃথিবীতে পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর তিনি সমস্ত ভোজী ও অভোজী বস্তু অধিকার করিয়া এই বিশ্বে ব্যাপ্ত হইলেন। তাঁহা হইতে বিরাটের উৎপত্তি হইল, এবং বিরাট হইতে পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিলেন। জন্মিয়া, তিনি অগ্র পশ্চাৎ উভয়ত পৃথিবী অতিক্রম করিয়া দেহ প্রসারণ করিলেন। পুরুষ রূপ বলি দ্বারা দেবতারা যে যজ্ঞ করিলেন, বসন্ত তাঁহার আজ্য, গ্রীষ্ম ইন্ধন ও শরৎ হবিঃ হইয়াছিল। অগ্রজাত যজ্ঞরূপ সেই পুরুষকে কুশোপরি বলি প্রদান করিয়া, দেবগণও সাধ্যায়সম্পন্ন ঋষিগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সর্ব্বলোক সম্পন্ন সেই যজ্ঞ হইতে ক্ষীর এবং নবনী সঞ্চিত হইল, এবং উক্ত যজ্ঞ বায়ব্য, আরণ্য ও গ্রাম্য পশু সৃষ্টি করিল। সর্ব্বলোক সম্পন্ন সেই যজ্ঞ হইতে ঋক্ ও সাম সমূহ জন্মলাভ করিল। তাহা হইতে ছন্দঃ সকল ও যজুঃ উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে অশ্ব ও দ্বিশ্রেণী দন্তবিশিষ্ট পশু সকল জন্ম লাভ করিল এবং তাহা হইতে গো, মেষ ও অজা উৎপন্ন হইল। দেবতারা যৎকালে পুরুষকে বিভক্ত করিলেন, তখন তাঁহাকে কত খণ্ড করিয়াছিলেন? ইহার মুখ কি, বাহুদ্বয়ই বা কি, ও ঊরু এবং পাদই বা কাহাকে বলে? ব্রাহ্মণ ইঁহার মুখ ছিলেন, বাহুদ্বয় দ্বারা রাজন্যের সৃষ্টি হইল, ইঁহার ঊরুদ্বয় তাহাই যাহা বৈশ্য, এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হইল। তাঁহার মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং নিশ্বাস হইতে বায়ু সৃষ্টি হইল। নাভি হইতে অন্তরীক্ষ, মস্তক হইতে দ্যুলোক, পদদ্বয় হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্

সমূহ সৃষ্ট হইল। এইরূপে সমস্ত লোক সৃষ্টি করিলেন। যৎকালে যজ্ঞোদ্যত দেবতারা পুরুষকে পশুরূপে বন্ধন করিলেন, তৎকালে তাঁহারা সপ্তপরিধি ও একবিংশ সমিধ স্থাপন করিয়াছিলেন! দেবতারা যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন। এই সকল প্রথম ধর্ম্ম ক্রিয়া রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই মহিমাময় ক্রিয়া সকল স্বর্গে সমুত্থিত হইয়াছে, যেখানেপূর্ব্বকালীন সাধ্যায় ও দেবগণ বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সৃষ্টির বিবরণ আমরা ঋগ্বেদে এইরূপ প্রাপ্ত হই। প্রাচীন ঋষিগণ সৃষ্টির যথার্থ তত্ত্ব ও স্রষ্টার সম্যক পরিচয় যে পাইয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। কিরূপে এই বিশাল ব্রাহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইল; এই চিন্তাতে তাঁহারা উন্মত্তবৎ হইয়া অদৃষ্ট হস্তে আত্ম সমর্পণ করিলেন।

'আমি কে'—'কোথা হইতে আসিয়াছি',—'কেন এ সংসারে অবস্থিতি',—'আমার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কি',—'কোথায় যাইব',—এবং বাহ্য জগতের সহিত আমার সম্বন্ধ কি',—এবং 'কাহার আজ্ঞায় এই বাহ্য জগৎ পরিচালিত হইতেছে; মানবচিত্ত এই সকল প্রশ্ন আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে করিতে নিগূঢ়ভাবে আত্ম চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গেল। চিন্তারও সীমা নাই, আত্ম-লোপেরও সীমা নাই; তথাপি চিত্তের শান্তি কোথায়? চতুর্দ্দিকে যে দিকে তাকাই, কেবল একমাত্র স্বচ্ছন্দ তিমিররাশি দিগ্বলয়কে বিনষ্ট করিয়া, বিকটবেশে যুগপৎ হৃদয়কে আকম্পিত ও আকুলিত করিয়া তুলিতেছে। তাহার উপর,—তাহার উপর—তাহার উপর, তথাপি কোথাও ইহার সীমা দেখিতে পাই না। আশা-নিরাশা-সম-প্রায় তরঙ্গপতিতবৎ কলশূন্য কালতরঙ্গে কেবল হাবুডুবু খাইয়া হাহাকার মাত্র সার। হাবুডুবু-হাহাকারের ঘটা পাঠক একবার দেখিতে চাও কি? ঐ দেখ একজন প্রাচীন, কিন্তু তখনও নবাগত, বৈদিক, কিরূপ ঘোর তরঙ্গে পতিত হইয়া কিরূপ হাবুডুবু খাইতে খাইতে কি ঘোর অস্ফুট চীৎকার করিতেছে! সে চীৎকারের ধ্বনি এরূপ

দিগন্ত-বিশ্রুত যে তাহার শব্দ এত দূরেও আমাদের কর্ণগত হওয়ার পক্ষে কিছুমাত্র ত্রুটি হইতেছে না ;—

"ন অসদ্ আসীদ্ নো সদ্ আসীৎ তদানীং
নাসীদ্ রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিম্ আবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিম্
আসীদ্ গহনং গভীরম্ ॥ ১
ন মৃত্যুর আসীদ্ অমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যাঃ
অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আসীদ্ অবাতং স্বধয়া তদ্ একং ত স্মাদ্ হ
অন্যদ্ ন পরঃ কিঞ্চনাস ॥ ২
তমঃ আসীৎ তমসা গুঢ়ম্ অগ্রে অপ্রকেতং
সলিলং সর্বং আ ইদম্।
তুচ্ছ্যেন আভূ অপিহিতং যদ্ আসীৎ তপসস্
তদ্ মহিমা অজায়তৈকম্ ॥ ৩
কামস্ তদ্ অগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ
প্রথমং যদ্ আসীৎ।
সতো বন্ধুম্ অসতি নিরবিন্দন্ হৃদি
প্রতীষ্যাকবয়ো মনীষা ॥ ৪
তিরশ্চীনো বিততো রশ্মির্ এষাম্ অধঃ স্বিদ্
আসীদ্ উপরি স্বিদ্ আসীৎ।
রেতোধাঃ আসন্ মহিমানঃ আসন্ স্বধা
অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫

কো অদ্ধা বেদ কঃ ইহ প্রবোচৎ কুতঃ

অজাতা কুতঃ ইয়ংবিসৃষ্টিঃ।

অর্বাগ্ দেবাঃ অস্য বির্জ্জনেন অথা

কো বেদ যতঃ আবভুব ॥ ৬

ইয়ং বিসৃষ্টির্ যতঃ আবভুব যদি বা

দধে যদি বা ন।

যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্

সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ.॥ ৭

ঋঃ বেঃ। ১০মঃ। ১২৯ সূঃ।

—সেই আদিতে সৎ, অসৎ, রজো বা ব্যোম্, ইহার কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। বলিতে পার এ সকল কিসের দ্বারা আবরিত ছিল, —বা কাহার অভ্যন্তরেই বা এ সকলের বীজ নিহিত ছিল? যাহাতে আবরিত ছিল, তাহা কি জল?—না "গহনম্ গভীরম্?" তখন হয়ত মৃত্যু বা অমৃতত্ত্ব ছিল না, রাত্রি বা দিবার প্রভেদ ছিল না, কেবল একমাত্র, যাহার অন্যতর বা উর্দ্ধে কেহ নাই, যিনি আপনাতেই নির্ভর করিয়া শ্বাসক্রীড়া নিরত,একমাত্র তিনিই বর্ত্তমান ছিলেন, অগ্রে কেবল অন্ধকার গূঢ়তম অন্ধকারে আবৃত, এবং সর্ব্বত্র "অপ্রকেতম্ সলিলম্" দ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল। এবং সেই একমাত্র যিনি তুচ্ছস্বরূপ এবং তুচ্ছদ্বারা আবৃত ছিলেন; তপোদ্বারা পুষ্টতা যুক্ত হইলেন। মনের প্রাথমিক বীজস্বরূপ কাম সর্ব্বাগ্রে তাহা হইতে উৎপন্ন, এবং কাম হইতে রেতঃ উৎপন্ন হইল। সদসদের সংযোগ রজ্জু স্বরূপ ইহার অবস্থিতি, কবিগণ আপনাপন অন্তঃকরণে বুদ্ধি দ্বারা অনুভব করিয়াছিলেন। যে রশ্মি জগৎব্যাপ্ত হইয়া বিস্তৃত তাহা কি অধঃ না উপরে অবস্থিতি ছিল? রেতঃ, মহিমা, এবং

স্বধা কি নিম্নে ও মহা শক্তি ঊর্দ্ধে ছিল? এই সৃষ্টি কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে?—কে ইহার সৃষ্টি করিল? কে জানে?—কে কহিতে পারে? দেবতারা কি পারেন? তাঁহারা ত সৃষ্টির পরে জন্মিয়াছেন, অতএব তাঁহারাই বা কেমন, করিয়া কহিবেন? অতএব কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? কে বলিবে? যাহারা সৃষ্টির পরে জন্মিয়াছে তাহাদের ত জানিবার সম্ভব নাই। যিনি এই বিশ্বের অধ্যক্ষ, যিনি স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন, তিনি কি এ তত্ত্ব জানেন? হয় ত তিনি এ তত্ত্ব জানিতে পারেন, অথবা হয় ত তিনিও ইহা জানেন না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রাহ্মণ ভারতের শ্রেষ্ঠ জীব, অপর সকলেই তাঁহার অধীন,—বৈদিক ও পৌরাণিক কালে ভারতের এই অবস্থা। মানুষ অথবা ইন্দ্রের কথা দূরে থাকুক্, স্বয়ং নারায়ণ, ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ-পদাহত হইয়া করযোড়ে বলিয়াছিলেন "ব্রহ্মণ, আপনার চরণে আঘাত লাগে নি ত?" সেই দিন হইতে বিষ্ণু ভৃগুপদচিহ্ন ধারণ করিলেন। এখন পাঠক দেখ, ভারতীয় ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ জীব কি না? তাঁহারা সেই ঘোরান্ধকারের মধ্য হইতেও "গহ্বণম্ গভীরম্" "অপ্রকেতম্ সলিলম্" সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। ইতি।

স্ত্রী-চরিত্র।

"বাণিজ্যেন গতঃ সমে গৃহ পতি র্বার্ত্তাপিন শ্রুয়তে,
প্রাতস্তজ্জননী প্রসূত তনয়া জামাতৃ গেহংগতা।
বালাহং নব যৌবনা নিশি কথং স্থাতব্য মস্মদ্ গৃহে,
সায়ং সংপ্রতিবর্ত্ততে পথিক হে স্থানান্তরং গম্যতাং।"—কালিদাস।

পুরুষের ভাগ্য এবং নারীর চরিত্র দেবতারাও বুঝিতে পারেন না—মনুষ্য কোন্ ছার? সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। অনেক সময় এই কথাটা মনে করিয়া আমরা

আত্মপ্রসাদ লাভ করি। অনেক সময় এই কথাটা বলিয়া অপরকে বুঝাই। কোন অমিতব্যয়ী, অমিতাচারী যুবা আত্মদুষ্কৃতনিবন্ধন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে এই বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করি। কোন তরলমতি নবীনা, পিতামহের যোগ্য বৃদ্ধ স্বামীর চরণারবিন্দে মতি স্থির না রাখিয়া, প্রতিবেশী যুবককে দেখিবার জন্য দিনে দশবার কলসীকক্ষে ঘাটের পথে যাতায়াত করে—আমরা পাড়ার পাঁচ জন এই প্রবাদ স্মরণ করিয়া তাহার কদাচারের ব্যাখ্যা করি। কিন্তু, পুরুষের ভাগ্য যেমন হউক, নারীচরিত্র কি সত্যই বুঝা যায় না? সম্যক্ না যাউক, বুঝিতে চেষ্টা করিলে কতকটা বোধ হয় বুঝা যাইতে পারে।

দুঃখের বিষয় এই যে, কেবল কতকটাই বুঝা যায়—সবটা বুঝিবার পথ আমরা আপনারাই অনেক দিন হইল রুদ্ধ করিয়াছি। এ সংসারে পুরুষ প্রতিপালক, স্ত্রীলোক প্রতিপালিত, এই সম্বন্ধ এত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং পুরুষের দ্বারা নারীচরিত্র সম্যক্ জ্ঞাত হওয়ার আর বোধ হয় উপায় নাই। এত কাল হইতে স্ত্রীজাতি পরমুখাপেক্ষিনী, পর প্রত্যাশিনী, পরান্নভোগিনী, পরাবসথশায়িনী, যে তাহাদের সকল কথা সেই পরের কাছে প্রকাশ হওয়া এক রূপ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। প্রতিপালকের কাছে প্রতি পালিতকে অনেক কথা লুকাইতে হয়—চিরপ্রতিপালক পুরুষের কাছে চিরপ্রতিপালিত স্ত্রীজাতির অনেককথা গোপনে থাকিবেই থাকিবে। যে চরিত্রগত স্বাধীনতা চরিত্রবিকাশের এক মাত্র পথ, তাহা তাহাদের নাই।

মনুষ্যজন্মের প্রথমাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগকে যে সকল লোকের সাহচর্য্য করিতে হইয়াছে—যে সকল স্বার্থপর, কলহরত আত্মসর্ব্বস্ব, উচ্ছৃঙ্খল, নিষ্ঠুর, পশুবৎ লোকের মধ্যে বাস করিতে হইয়াছে—যে-সকল লোকের মন রাখিয়া জীবন ধারণ করিতে হইয়াছে। মনুষ্যই

কি, আর অন্য জীবই কি, যে অবস্থায় পতিত হয়, ক্রমে তদুপযোগিতা লাভ করে, সেই অবস্থানুসারে প্রকৃতি গঠিত হয়—না হইলে রক্ষা নাই।

সেই সকল লোকের কাছে স্ত্রীলোকদিগকে অনেক সময়ে মনের ভাব গোপন করিয়া চলিতে হইয়াছে। যাহাকে পরের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়, বিশেষতঃ যাহাকে নির্দ্দয় দুরন্ত লোকের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়; তাহাকে অনেক মনের কথা, হৃদয়ের অনেক ব্যথা, চিত্তের অনেক বেগ, অন্তরের অনেক সাধ গোপন করিতে হয়। যদি কখন কোন প্রতিযোগীনী প্রতিবেশিনীর কর্ণছিদ্রে বিচিত্র প্রস্তর, কবরীতে নূতন পালক, পরণে রঞ্জিত বল্কল দেখিয়া, আপনার জীর্ণ বল্কল, মলিন পালক, পুরাতন কর্ণভূষার সহিত তুলনা করিয়াছে, তাহা হইলে আপন মনেই মর্ম্মপীড়িতা হইয়াছে—দুঃখ, ঈর্ষা, অভিমান, কখন সাহস করিয়া মুখে ফুটিয়া ব্যক্ত করিতে পারে নাই—কখন আপনার হীনাবস্থার জন্য জোর করিয়া দুটো কথা স্বামীর কাছে বলিতে পারে নাই। বালিকা বিদ্যালয়ের আউট্ বিধুমুখী ন্যায়লঙ্কার, মিসেস লুইজা বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্যতার পতাকাধারিণীগণের ন্যায় যদি তাহারা যার তার অঙ্গে নূতন অলঙ্কার দেখিয়া স্বামীর কাছে হাতনাড়া দাঁতঝাড়া দিতে যাইত, তাহা হইলে হাত নাড়িয়া, দাঁত ঝাড়িয়া আর তাহাদিগকে জীবলোকে থাকিতে হইত না—মুখের কথা মুখে থাকিতে থাকিতে নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে শূলবিদ্ধ হইতে হইত। এবং ইহা তাহারা বিলক্ষণ জানিত বলিয়া চিত্তবৃত্তি নিচয়ের উপর চিরকাল শাসন রাখিয়া আসিয়াছে। সেই আদিম অসভ্যাবস্থায় যদি কখন কাহারও রূপ দেখিয়া, তাহার দাসী হইতে সাধ গিয়াছে—মনের সাধ মনেই থাকিয়া গিয়াছে সে সাধ বাহিরে প্রকাশ পাইলে তন্মুহূর্ত্তেই তাহাকে ভবের হাট হইতে দোকান পাট উঠাইতে হইত। সে, যে দৃষ্টিপথে চিত্তহারা হইয়াছে,

এ কথা যদি কখন স্বামী ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিয়াছেন, বুঝিতে পারিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, তবে স্বামী-হৃদয় হইতে সেই সন্দেহ দূর করিবার জন্য শত যত্ন করিতে হইয়াছে। এবং সেই যত্নে কৃতকার্য্য হওয়ার উপর তাহার জীবন নির্ভর করিয়াছে। কাজেই ইহার যে সকল তন্ত্র মন্ত্র আছে, তাহাতে ক্রমে এক প্রকার সিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। মনের আগুন মনে ঢাকিয়া রাখিয়া বাহিরে এমন ভালবাসা জানাইবে যে, সে তোমা ভিন্ন আর কাহারও নয়। তুমি তাহাতেই প্রতারিত হইবে। চক্ষের জল তাহারা ইচ্ছা করিলেই ফেলিতে পারে। হলাহল মিথ্যা কথা তাহারা এমন ভঙ্গী করিয়া, এমন সাজাইয়া বলিতে পারে, যে মূর্ত্তিমান সত্যও তাহার কাছে মিথ্যা হইয়া যায়। এইরূপে তাহারা মনের কথা লুকাইতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে অভ্যাসের ফল এ কাল পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতিতে বিদ্যমান—তাহার চিত্তের গতি তুমি কখন বুঝিতে পারিবে না—অবলীলাক্রমে তোমার চক্ষে ধূলা দিবে। তাহার কথা তুমি কখন বাহির করিয়া লইতে পারিবে না—বুক ফাটিয়া যাইবে, কিন্তু মুখ ফুটিবে না।

আবার সেই সকল উদ্ধত, নির্দ্দয়, ক্রোধপরবশ আদিম অসভ্যদিগের হস্তে অনেক সময়ে অপমানিত, তিরস্কৃত, প্রহারিত হইয়াছে, অথচ কোন কথা কহিতে সাহস হয় নাই, প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতে পারে নাই—বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় নীরবে, নিভৃতে আপন মর্ম্মপীড়ায় আপনি পীড়িত হইয়াছে। রাগ, দ্বেষ, অভিমান, সকলে জলাঞ্জলি দিয়া সেই অত্যাচারী স্বামীর সঙ্গে আবার সাহচর্য্য করিতে হইয়াছে। গৃহপালিতা হরিণীর ন্যায়, যে হস্ত বধার্থে শূল উত্তোলন করিয়াছে, সেই হস্তই আবার আদরে লেহন করিয়াছে। বর্ষাসম্ভূত কর্দ্দমরাশির ন্যায়, যে পদে মর্দ্দিত হইয়াছে, সেই পদই আবার জড়াইয়া ধরিয়াছে। যে মুখের বাক্যবিষে মর্ম্মে মর্ম্মে বৃশ্চিক দংশন

হইয়াছে, সেই মুখে হাসি দেখিবার জন্যই আবার সহস্র উদ্যোগ করিতে হইয়াছে—হৃদয়ে লুকাইয়া মুখে মধুবর্ষণ করিতে হইয়াছে। এ সকলই তাহাদিগকে নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছে, কাহারও কাছে আপনার মনের কথা, মর্ম্মের ব্যথা প্রকাশ করিতে সাহস নাই, কেন না যদি তাহা কোন প্রকারে স্বামীর কর্ণে উঠে, তাহা হইলে বিভ্রাট পড়িয়া যাইবে—অধিকতর অপমানিত, তিরস্কৃত, প্রহারিত হইতে হইবে—হয় ত গৃহবহিস্কৃত, সুতরাং আশ্রয়শূন্য হইতে হইবে—হয়ত প্রস্তর-কুঠারাঘাতে মরিতে হইবে—হয় ত অনাহারে মরিতে হইবে। সেই জন্য তাহারা সবই মনে মনে সহ্য করিয়াছে। যদি চক্ষে জল আসিয়াছে, তাহা চক্ষেই শুকাইয়াছে। যদি অন্তর বিদীর্ণ করিয়া বিষাদ নিশ্বাস উঠিয়াছে, তাহা অন্তরের অন্তরেই বিলীন হইয়া গিয়াছে—স্ফীত হৃদয়ের ব্যথা সেই স্ফীত হৃদয় ব্যতীত আর কেহ জানে নাই—কাতর প্রাণের কথা সেই কাতর প্রাণ ব্যতীত আর কেহ শুনে নাই। যখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তখন হয় ত নিকটবর্ত্তিনী পর্ব্বতবাহিনী তরঙ্গিনীর তরঙ্গে আপনার নয়নের তরঙ্গ মিশাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে—হয় ত কুটীর পার্শ্বস্থ বনভূমি সঞ্চারী আলস্য মন্থর বায়ুতে আপনার নৈরাশ্যকাতর অন্তরের শ্বাস লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে—জীবলোকের সহানুভূতি আহ্বান করিতে বড় সাহস হয় নাই। এই রূপ সহ্য করিয়া করিয়া স্ত্রী চরিত্রে সহিষ্ণুতা এবং চিত্ত সংযম গুণ বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছে। উত্তরাধিকার নিয়মে তাহা স্ত্রী চরিত্রে বদ্ধমূল হইয়াছে। এখনও আমরা দেখিতে পাই, পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সহিষ্ণুতা অধিক। প্রাচীনকালে যে তাহারা রোগে, শোকে, অনাদরে, নির্য্যাতনে মর্ম্ম পীড়ায়, ক্লিষ্ট, আর্ত্ত, ক্ষুন্ন, পীড়িত, ব্যথিত হইয়াও গৃহধর্ম্মে উদাসীন বা স্বামী সেবায় বিরত হইতে পায় নাই—গৃহধর্ম্মে উদাসীন হইলে বিলিব্যবস্থার অভাবে পরিবার উৎসন্ন গিয়াছে—

স্বামীসেবায় বিরত হইলে জীবনোপায়ে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে—সে কঠোর শিক্ষার ফল এ পর্য্যন্ত স্ত্রীচরিত্রে জাজ্বল্যমান। যে পীড়া হইলে পুরুষ শয্যাত্যাগ করিতে পারে না, স্ত্রীলোকে তদপেক্ষা উগ্রতর পীড়া লইয়াও গৃহকার্য্যে সাধ্যানুসারে সাহায্য করে। যে ব্যাধিতে পুরুষ ইহলোক পরলোক ভুলিয়া যায়, তদপেক্ষা শত-গুণ তীব্রতর ব্যাধির যাতনার মধ্যেও স্ত্রীলোকে সামান্য গৃহকার্য্যটিও ভুলে না—ছোট ছেলেটি দুধ্ পায় নাই, বড় মেয়েটির স্নান হয় নাই, স্বামীর তাম্বুল প্রস্তুত হয় নাই, যাতনার মোহেও এই সকল তাহার জপমালা হইয়া থাকে। কুলীন কুমারী চিরকৌমার্য্যভার বহন করিতে অপারগ নহে। বালবিধবা চিরবৈধব্য যন্ত্রণা রূপ নিয়ত প্রজ্জ্বলিত রাবণের চিতা বুকে করিয়া বহিতে অসমর্থ নহে। তুমি তাহার উপর সহস্র অত্যাচার কর, তবু সে তোমা বৈ জানে না। তুমি তাহাকে পদাঘাত কর, তবু সে তোমার পদারবিন্দ ব্যতীত আর কিছু ভাবে না। তুমি প্রমোদগৃহ হইতে নিশীথে গৃহে প্রত্যা-বর্ত্তন কর সে তোমার আশাপথ চাহিয়া বসিয়া থাকে—তোমার আহার্য্য কাছে করিয়া তোমার জন্য জাগিয়া বসিয়া থাকে। তুমি যদি না আস তবু সে বসিয়া থাকে—পল যায়, দণ্ড যায়, প্রহর যায় সমান বসিয়া আছে। চন্দ্র উদয় হইয়া তাহাকে যেখানে দেখে, অস্ত যাইবার সময়েও তাহাকে সেই খানেই দেখিয়া যায়। শেষে চন্দ্র অস্ত যায়, নক্ষত্র সকল একে একে নিবিয়া যায় রাত পোহাইয়া যায়, দিগাঙ্গনারা উপরের নীলসাগরের পূর্ব্ব উপকূলে সুবর্ণ বালুকা একবার স্তূপীকৃত করিয়া, আবার ছড়াইয়া ফেলিয়া দেবখেলা আরম্ভ করে, তখন হয় ত একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, একবার অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া আবার গৃহকার্য্যে লিপ্ত হইতে যায়। পুরুষকে এতটা সহ্য করিতে হইলে সে হয় ত আত্মঘাতী হয়—বিষ খায়, জলে ঝাঁপ দেয়, গলায় ফাঁস লাগাইয়া মরে। সহিয়া সহিয়া এতটা সহ্য হইয়া

গিয়াছিল, যে অবশেষে হিন্দুর মেয়েতে জ্বলন্ত চিতায় জীবন্তে পুড়িয়া মরাও সহ্য হইত।

স্ত্রীচরিত্রের আর একটা ভঙ্গী দেখ। মহাভারতের সাবিত্রী সতী, লক্ষ্মী, সুন্দরী; কত রাজা তাঁহার পাণি প্রার্থী; কিন্তু তাঁহার কাহাকেও মনে ধরে নাই, স্বল্প জীবন সত্যবান্ তাঁহার হৃদয় রঞ্জন, ইহা মুক্তকণ্ঠে সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশ করিলেন।

যে গভীরতত্ত্ব সাবিত্রী সত্যবানের মিলনে পরিব্যক্ত হইয়াছে, মহাভারতকার দ্রৌপদীচরিত্রেও সেই তত্ত্ব লুকাইয়া রাখিয়াছেন। পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের উপরই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসা ছিল; সেই জন্য দ্রৌপদীর সশরীরে স্বর্গে যাওয়া হইল না। শুদ্ধ তাহাই নহে। যে দ্রৌপদী সতী বলিয়া প্রাতঃস্মরণীয়া, মহেন্দ্র তুল্য পাঁচ পাঁচ জন স্বামী থাকিতেও সেই পাঞ্চালী কর্ণের প্রতি আসক্ত ছিলেন —— লুকাইয়া লুকাইয়া, মনে মনে তিনি কর্ণকে স্বামী প্রার্থনা করিতেন। কেন এমন হইল? কেন সর্ব্বজন কামনীয়া সাবিত্রী প্রায় বিগত জীবন, রাজ্য-ভ্রষ্ট সত্যবানের ভাগ্যে আপন ভাগ্যে মিশাইলেন? কেন সতী কুলের আদর্শ স্থানীয়া দ্রৌপদী কর্ণকে স্বামী প্রার্থনা করিলেন। চিন্তাশীল পাঠক বলিবেন, নারী-হৃদয়ের উপর বীর্য্যের মোহ বড় প্রবল। কর্ণ—অর্জ্জুন অপেক্ষা মহা বীর্য্যবান্।

চিরকাল যে স্ত্রীজাতি সবল ও ক্ষমতাবানের উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছে, সংস্কার বশতঃ এখনও ক্ষমতা দেখিলেই সেই স্ত্রী হৃদয় আকৃষ্ট হয়। যেখানেই ক্ষমতার বিকাশ দেখে, সেই থানেই স্ত্রী হৃদয় অবনত, অনুগত, পদানত হইয়া পড়ে। ইহার কারণ, এই বীর্য্যানু-রাগ, এই ক্ষমতা-পক্ষপাতিতা, বহুকালের এই সবল নির্ভরের অভ্যাস।

ধর্ম্মে দেখ। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্ম শাসনের অধিকতর

অধীন—ব্রত, উপবাস, তপঃ, জপ স্ত্রীলোকে যত করে, পুরুষে তাহার এক পাইও করে না। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের দেবতার সংখ্যাও অধিক—পুরুষের তেত্রিশ কোটি ত আছেই, তাহার উপর ষষ্ঠী, মাকাল, মনসা, শীতলা, ইথু, সুবচনী, গোরু বাছুর, ছাই ভস্ম, স্ত্রীলোকের যে কত দেবতা আছে, আমারা ঘরের লোক হইয়াও সকল খবর রাখি না, সকল কথা জানি না। গুরু, পুরোহিত, গণক ঠাকুর, তীর্থের পাণ্ডা, গৌরাঙ্গের চেলা, ঈশার পাদ্রী ইহাদের সুতা পুরুষের হাটে বড় বিকায় না, কিন্তু স্ত্রী মহলে ইঁহাদের একাধিপত্য। জগন্নাথের যাত্রীদিগের পনর আনা উনিশ গণ্ডাই স্ত্রীলোক। গ্রীর্জ্জায় দেখ, অধিকাংশ আসনই মিস্, মিসেস্ দ্বারা অধিকৃত। তাহার মধ্যে পুরুষ সমুদ্রে জলবিন্দুর ন্যায়, কে কোথায় পড়িয়া থাকে। সাগরসঙ্গমে স্ত্রীলোকের সন্তান ফেলিয়া দেওয়ার অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়—পুরুষে ফেলিয়াছে, এরূপ কথা কখন শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য ভাব প্লাবিত বঙ্গদেশে আজিও যে দোল দুর্গোৎসব হয়;—এই এংগ্লোবর্ণেক্যুলার সমাজে, এই হ্যাট্ কোট্ মদ্য মাংসের মধ্যে আজিও যে শঙ্খ ঘণ্টা বাজে, হোমাগ্নি জ্বলে, দেবতা ব্রাহ্মণের পূজা হয়, অতিথি অভ্যাগতে এক মুষ্টি অন্ন পায়, সে কেবল স্ত্রীলোকের প্রসাদাৎ। বাবু নিজে দেবতা ব্রাহ্মণের বড় একটা ধার ধারেন না, কিন্তু কি করেন—গৃহিণীর অনুরোধ, মহাগুরুর আজ্ঞা, না রাখিলে রক্ষা নাই। কিন্তু তাঁহার অনুরোধ রাখা পর্য্যন্তই—স্ত্রীলোকেরাই পূজার উদ্যোগ করিতেছে, উপবাস করিতেছে, সকল বিষয়ের তদারক রাখিতেছে; বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া, ইয়ার লইয়া, মদ খাইয়া বমি করিতেছেন, বালিশ ছিঁড়িয়া তুলা খাইতেছেন।

ধন একটা সামাজিক শক্তি; বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান শক্তি। ধনের দ্বারা সিদ্ধ না হইতে পারে এমন কার্য্যই নাই, ধনের দ্বারা

না ঢাকিতে পারে এমন পাপই নাই, ধনের দ্বারা আয়ত্ত করা না যাইতে পারে এমন পদার্থই নাই—সুতরাং ধনকে সর্ব্বপ্রধান শক্তি বলিতেছিলাম। স্ত্রীচরিত্রে দেখিবে, ঐশ্বর্য্যোপাসনার ভাব অত্যন্ত প্রবল। প্রবল বলিয়া লক্ষ্মী পূজায় স্ত্রীলোকের এত ভক্তি, অনন্তব্রতে এত আসক্তি। কন্যার বিবাহ দিতে, পিতা দেখেন, বর কেমন—মাতা দেখেন, ঘর কেমন—পিতার ইচ্ছা, পাত্রটি সুপাত্র হয়, সদ্বংশজাত হয়, সচ্চরিত্র হয়, লেখা পড়া জানে; মাতার কামনা, বিলক্ষণ বিষয় আশয় থাকে, মেয়েটিকে পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সোণা রূপায় ঢাকিয়া দেয়। স্ত্রীজাতি প্রচলিত যে সকল ব্রত অনুষ্ঠানের কথা শুনিবার রীতি আছে, তাহার সকল কথা-তেই শুনিবে, ঐশ্বর্য্যলাভই চরম ফল। ব্রতকারিণী হয় রাজ্ঞী হইল, নয় অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিল, নয় ঘরে লক্ষ্মী অচলা হইলেন। আবার ধনের মায়ায় অনেক সুন্দরী, অশীতিপর শ্মশানোন্মুখ বৃদ্ধকেও আত্ম সমর্পণ করে, এমন কি প্রলোভনে পড়িয়া সতীত্ব ধর্ম্ম পর্য্যন্ত জলাঞ্জলী দেয়।

যে চিরকাল বীর্য্যবানকে ভাল বাসিয়া আসিয়াছে, বীরের অবশ্য-স্থাতব্য গুণ সকলও সে ভাল বাসিবে এবং তাহার বিপরীত গুণ বা দোষ সুতরাং তাহার অপ্রীতিকর হইবে। একটা কথা দেখ। যে বীর সে উদার প্রকৃতি, উন্নত চরিত্র, প্রশস্ত হৃদয়। প্রকৃত বীরের হৃদয়ে নীচতা থাকে না। স্ত্রীচরিত্রে দেখিবে, নীচের প্রতি ঘৃণা দৃঢ়সম্বন্ধ। তোমার প্রণয়িনী তোমার সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা করি-বেন, কিন্তু তোমার নীচতা মার্জ্জনা করিবেন না। যে দিন তিনি তোমার নীচতা দেখিতে পাইবেন, সেই দিন নিশ্চয় জানিও তাঁহার ভাল বাসায় ভাঁটা ধরিয়াছে। তুমি যদি তাঁহাকে সহস্র অযত্ন কর, যদি তাঁহার প্রাণপণ প্রণয়ের বিনিময়ে তিনি তোমাকে একবার চক্ষের দেখাও দেখিতে না পান, একটু মুখের হাসির সম্বর্দ্ধনাও না

পান, যদি তাঁহার উদ্বেগপূর্ণ দিবস, নিদ্রা শূন্য রাত্রি, অনুক্ষণ মর্ম্ম-দাহের বিনিময়ে কেমন আছ বলিয়া একটা কথার কথাও না সুধাও, তবু তিনি তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী দাসী হইয়া থাকিবেন; কিন্তু তুমি যদি তাহার অনাদৃত প্রণয়ের কথা লইয়া গর্ব্ব বা উপহাস কর, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, সেই দিন হইতে তিনি তোমার শত্রু।

যে হৃদয় চিরকাল শক্তি ও ক্ষমতার অনুরাগী, ভীরুতা এবং দৌর্ব্বল্য অবশ্যই তাহার বিরাগভাজন ও ঘৃণাস্পদ হইবে। সেই জন্য মুখচোরা, মেয়েমুখো পুরুষ স্ত্রী লোকেরও উপহাসের পাত্র। স্ত্রী লোকে যে বৃদ্ধ স্বামীকে ঘৃণা করে তাহা ও এই কারণে। বার্দ্ধক্য দৌর্ব্বল্যের আধার, বার্দ্ধক্য দ্বিতীয় শৈশব—অলস, অবস, অসহায়, পরামুখাপেক্ষা, পরাধীন—শুতে পেলে বসতে চাহে না, বসিলে উঠিতে চাহে না, বিছানায় পড়ে আর ঘুমায়। আহার করিয়া উঠিয়া এক প্রহর কাল হাঁপাইয়া মরে; আবার তামাক খাইয়া যেরূপ মারাত্মক কাশি কাশে, যে রকম সাংঘাতিক দম্ টানে, মনে হয় বুঝি বৈধব্য ঘটালে। বীর্য্য পক্ষপাতী রমণী হৃদয় কেন তাহাতে মজিবে? যুগে যুগে যে হৃদয় ক্ষমতা ও শক্তির পূজা করিয়া আসিয়াছে, সে হৃদয় অকস্মাৎ চিরন্তন সংস্কার ভুলিয়া জরা ও দৌর্ব্বল্যের উপাসনা কেন করিবে? নির্ব্বান দীপের দশালগ্ন আলোক বিন্দুতে ঘর আলো হইবে কি? কিন্তু তাই বলিয়া আমরা, যাঁহারা বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে নিন্দা করি না; যাঁহারা করিবার ইচ্ছা রাখেন, তাঁহাদিগকেও ভগ্নোদ্যম করিতে চাহি না, কেন না যাঁহারা বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করেন তাঁহারা প্রায় ভালবাসার কামনায় করেন না—অসময়ে কে করিবে, এই বলিয়া করেন। আর বাঙ্গালীর মেয়ে, প্রাণের দায়ে না হউক, অন্ততঃ ধর্ম্মের দায়েও অসময়ে করিবে, অসময়ে দেখিবে। তবে ইহাও বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, বৃদ্ধ যদি ঠিক যুবা হইতে পারেন, তাহা হইলে বোধ হয় যুবতী

ভার্য্যার তত বিরাগভাজন হইতে হয় না। বৃদ্ধের শরীরে যদি যৌবনের সজীবতা, চপলতা, তেজস্বিতা, প্রফুল্লতা, ব্যগ্রতা, উদারতা, উদ্যমশীলতা, উৎসাহ পূর্ণতা, আশা, পিপাসা, আসঙ্গলিপ্সা থাকে, তাহা হইলে রমণী হৃদয়ও বোধ হয় বার্দ্ধক্য ভুলিয়া বৃদ্ধের বশ হয়। তা, না বার মন তৈলই পুড়িবে, না রাধাই নাচিবে।

এতক্ষণ আমরা যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, তাহা যদি সত্য হয়, যদি সত্যই নারীহৃদয় তেজস্বিতা ও শক্তির পক্ষপাতী হয়, যদি বাস্তবিকই নারীপ্রকৃতিতে সকল প্রকার দৌর্ব্বল্যের প্রতি অশ্রদ্ধা বদ্ধমূল থাকে, তাহা হইলে স্ত্রৈণ পুরুষদিগকে আমরা একটু সাবধান হইতে বলি। স্ত্রৈণতা মানসিক দৌর্ব্বল্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে নিজে অক্ষম সেই অন্যের উপর নির্ভর করে; যে আপনার পথ আপনি দেখিতে পায় না, সেই পরপ্রদর্শিত পথে চলে। তাহার উপর আবার যে ব্যক্তি বর্ণজ্ঞান শূন্যা, সংসার বোধ বিবর্জ্জিতা, অন্তঃপুরবদ্ধা স্ত্রীলোকের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহার ন্যায় দুর্ব্বলচেতা আর কে? পুরুষের দ্বারায় স্ত্রীলোক পরিচালিতা, ইহাই স্ত্রী পুরুষের স্বাভাবিক অবস্থা। পুরুষের উপর নির্ভর করিবার দিকে স্ত্রী প্রকৃতির নৈসর্গিক টান। সুতরাং পুরুষকে স্ত্রীলোকের আঁচলধরা হইতে দেখিলে স্ত্রীলোকে অবশ্যই তাহাকে মনে মনে অবজ্ঞা করিবে। যাঁহারা মনে করেন যে স্ত্রীর কাছে রামবল্লভ হইয়া থাকিলে এবং স্ত্রীর সকল কথায় মোসাহেবের মতন আজ্ঞা হুঁ, করিলেই স্ত্রী বড় ভালবাসিবে, তাঁহারা বড় ভ্রান্ত। রামবল্লভ শ্রেণীর পুরুষকে কস্মিন্ কালে কোন স্ত্রীলোক ভালবাসিতে পারে না—ঢেঁকি স্বর্গেও ধান ভানে। তবে, আপনার প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য হয়ত বেশ খাতির যত্ন করিবে, ধর্ম্ম ভাবিয়া হয় ত বাহিরে শ্রদ্ধা করিবে; কিন্তু যাহার নাম ভালবাসা, যে মর্ম্মান্তিক নেশায় অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত বিভোর হইয়া থাকে, তাহা কস্মিন্ কালে কোন রামবল্লভ স্ত্রীলোকের নিকট পায় নাই, পাইবে না।

তবে, স্ত্রী যাঁহাদের মরণ কাঠি ও জীবন কাঠি, যাঁহারা স্ত্রীর আজ্ঞা প্রত্যাদেশ হইতেও বড় বলিয়া জানেন, তাঁহারা একটু বুঝিয়া চলেন, এই অভিপ্রায়ে কথাটার উল্লেখ করিয়া রাখিলাম মাত্র। ইতি।

ব্রজ-লীলা-রহস্য।

"বিদ্যাবতাং ভাগবতে পরীক্ষা।"

হিন্দুধর্ম্ম চিরদিন সাহিত্য মণ্ডিত; ধর্ম্ম বল, ইতিহাস বল, জীবনী বল, ভূতত্ত্ব, খতত্ত্ব হিন্দুর সমস্তই কবিতায় গ্রথিত; হিন্দু চিরদিন কবি; হিন্দুর অন্তঃকরণ চিরদিনই কবিতাপূর্ণ। আর্য্যগণ হিন্দুকুশ পার হইয়া যথনই স্বরস্বতী, দৃষদ্বতী তীরে ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি প্রদেশে নবাধিষ্ঠিত হইতেছিলেন তখন হইতেই আর্য্যের অন্তঃকরণ কবিতাপূর্ণ। তখন, জ্ঞানের শৈশবাবস্থায়, শিশু-সারল্যময় অন্তরে, সোমরসে বিমুগ্ধ আর্য্য-ঋষিগণ সরলতাময়কবিতায়, "অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্ন ধাতবম্।" ঘোর দাহিকাশক্তিসম্পন্ন অনলকে, মহা-দ্যুতি মরীচিমালী, শান্তদ্যুতি সুধাকরকে স্তোত্রগীতে আহ্বান করি-তেন, ও আকস্মিক দৈববিপদাদি হইতে রক্ষার্থ ইন্দ্রকে অনুরোধ করিতেন। তখন আর্য্যহৃদয় সরল কবিতার আধার, তখনও আর্য্য-কবি, এই কবিত্বের ফল, বেদ। বেদে আমরা একত্রে তিনটী বিষয় প্রাপ্ত হই। প্রথমতঃ ধর্ম্ম, দ্বিতীয়তঃ কবিত্ব, ও তৃতীয়তঃ তদানীন্তন সাহিত্যের গতি। অনন্তর কয়েক শতাব্দীর পরে এই শান্তি, সন্তোষ ও সারল্যময় সত্যযুগের অবসান হইল, ত্রেতা আসিল। ত্রেতায় হিন্দু সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত—সমাজে নানা স্বভাব সম্পন্ন নানা লোকের সমাগম হইয়াছে, ও সমাজের ভিন্ন ভিন্ন নূতন প্রয়োজনেরও উৎপত্তি হইয়াছে। ক্ষত্রিয়বর্ণ বাহুবলে নানা দেশাধিকার করতঃ বারাণসী, অযোধ্যা, মিথিলা ইত্যাদি রাজ্য

সংস্থাপনে নিযুক্ত। নানা যুদ্ধ বিগ্রহে, অসম্বন্ধ উচ্ছৃঙ্খল সমাজ বন্ধনে নিযুক্ত থাকিয়াও হিন্দু কবি। এই কবিত্বের ফল—জীবনী, ইতিবৃত্ত, ও ধর্ম্ম মূলক রামায়ণ। মহর্ষি বাল্মীকির কৃত রামায়ণ ত্রেতার সাহিত্য ও কবিত্বের প্রদর্শনী স্বরূপ। আবার এই রামায়ণেই ধর্ম্ম নিহীত। সেই নিমিত্তই পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্ম চিরদিনই সাহিত্য মণ্ডিত। দেখিতে দেখিতে ত্রেতা অতীত হইল, দ্বাপর উপস্থিত। এই যুগে আর্য্যগণ আরও উন্নতি লাভ করিয়াছেন। এই দ্বাপরের শেষে ও কলির প্রাক্কালে "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়" শ্রীকৃষ্ণ জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই সময়ে মহাভারত রচিত হইল।

এই মহাভারতীয় কৃষ্ণচরিত্রকাব্য সংসারে তুলনারহিত। (১) যে

---

(১) ডাক্তার বন্দ্যো তদীয় ষড় দর্শন সংবাদে লিখিয়াছেন। "কৃষ্ণাবতারের বৃত্তান্ত কোন প্রাচীন গ্রন্থে নাই" কেবল ভাগবতে আছে, তাহা বোপদেবের কৃত সুতরাং আধুনিক ইহা সকলেই স্বীকার করে।" পণ্ডিতেরা নহে, তবে অর্ব্বাচীন বঙ্গীয় খ্রীষ্টানেরা করিতে পারে, শুনিতে পাই কেহ কেহ নাকি কৃষ্ণ ও খ্রীষ্ট এক বলিয়াও স্বীকার করে। যাহাহউক, মহাভারতে কৃষ্ণচরিত্র পাওয়া যায় আর ঐ গ্রন্থ ব্যাসের রচনা। সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, মহাভারত খ্রীষ্ট জন্মের অন্ততঃ ১৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়, আর কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের প্রায় সমবয়স্ক, যুধিষ্ঠির—

"শতেষু ষটষু সার্দ্ধেষু ত্রধিকেষুচ ভূতলে,
কলের্গতেষু বর্ষানামভবন্‌কুরুপাণ্ডবাঃ।—কাঃ রাঃ তঃ]।

এখন কলির বয়স ৪৯৮৫ ইহা হইতে ৬৫৩ বাদ দিলে ৪৩৩২ হয়। সুতরাং যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণ খ্রীষ্টের ২৪৪৭ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। এখন দেখ, ভাগবতে কৃষ্ণাবতারের মূল কথা নহে, মূল কথা ভারতে। বন্দ্যো মহাশয় লিখেন ভাগবত বোপদেবের রচনা। সুতরাং আধুনিক, ডাক্তার উইলসন সাহেব বিষ্ণু পুরাণের উপক্রমণিকায় বোপদেবকে হেমাদ্রির সভা পণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই হেমাদ্রি ১২১২ শকাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, যদি ১২১২ শকাব্দীয় বোপদেব, ভাগবত-রচনা করিলেন তাহা হইলে কি প্রকারে তাঁহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী যাস্ক গ্রন্থকারগণ ভাগ-

ব্রজলীলা শ্রীমদ্ভাগবতে অত্যন্ত পরিস্ফুট, ইহাতে তাহার সূচনাও নাই। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় রাজনীতিবিদ্—সাম্রাজ্যের গঠন বিশ্লেষণে বিধাতৃতুল্য কৃতকার্য্য—সেই জন্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া কল্পিত। শ্রীকৃষ্ণ ঐশিক শক্তিধর বলিয়া কল্পিত, কিন্তু মহাভারতে ইনি অস্ত্রধারী নহেন, সামান্য জড় শক্তি বাহুবল ইঁহার বল নহে; উচ্চতর মানসিক বলই ইঁহার বল। যে অবধি ইনি মহাভারতে দেখা দিলেন সেই অবধি এই মহেতিহাসের মূল গ্রন্থি রজ্জু ইঁহার হাতে—প্রকাশ্যে কেবল পরামর্শদাতা—কৌশলে সর্ব্বময়কর্ত্তা। ইঁহার কেহ মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, কেহ অন্ত পায় না, সে অনন্ত চক্রে কেহ প্রবেশ করিতে

বতের রচনা প্রমাণ স্বরূপে স্ব স্ব গ্রন্থে উদ্ধৃত করিলেন। প্রমাণ—"শঙ্করাচার্য্য সময়াদুত্তরে বৎসর শতদ্বয়ে ব্যতীতে বোপদেবোঽভূৎ।" দু শত বৎসর পূর্ব্বে কি প্রকারে শঙ্কর তদীয় বিষ্ণু সহস্র নাম ভাষ্যে ও চতুর্দ্দশ মত বিবেকে ভাগবতের বচন উদ্ধৃত করিলেন, আবার শঙ্করের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী হনুমত ও চিৎসুখ মুনি কি প্রকারে ভাগবতের টীকা করিলেন।

"বোপদেব কৃতস্চেচ বোপদেব পুরাভবৈঃ।
কথং টীকা কৃতা বৈম্ভর্হনুমৎ চিৎসুখাদিভিঃ॥" সিদ্ধান্তদর্পণ

ইঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী গৌরপাদ প্রভৃতি ৪৬ জন পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারের গ্রন্থে আমরা ভাগবতের বচন দেখিতে পাই। যদি বোপদেব ভাগবতের লেখক হইবেন তাহা হইলে কখনই হরিলীলাখ্য ভাগবতের টীকায় তিনি গ্রন্থকার না লিখিয়া টীকাকারবলিয়া

"শ্রীমদ্ভাগবত স্কন্ধাধ্যায়ার্থাদি নিরূপ্যতে,
বিদুষা বোপদেবেন মন্ত্রি হেমাদ্রি তুষ্টয়ে।"

পরিচয় দিতেন না, গ্রন্থকার বড় কি টীকাকার বড়। এই সমস্ত প্রমাণে দেখা যায় ভাগবত অতি প্রাচীন গ্রন্থ। তবে ইহার রচক কে, তাহা নির্দ্দেশ করা দুষ্কর। কেহ কেহ বলেন বেদব্যাস ইহার রচনা কর্ত্তা, কিন্তু তাহাতেও আমাদিগের আপত্তি আছে। অতএব ডাক্তার বন্দ্যোর সিদ্ধান্ত যে ভ্রম বিজৃম্ভিত তাহার সন্দেহ নাই। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যরূপ অত্যুচ্চ শৈলে আরোহণ করিতে না পারিয়া নিম্ন হইতে দুই খানি উপল খণ্ড সংগ্রহ করতঃ রত্ন বলিয়া বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয়ানদিগকে প্রদান করিয়াছেন।

পারে না। ইহাঁর যেমন দক্ষতা, তেমনই ধৈর্য্য। উভয়ই দেবতুল্য। পৃথিবীর বীরমণ্ডলী একত্রিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত; যে ধনু ধরিতে জানে সেই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবদিগের পরমাত্মীয় হইয়াও, কুরুক্ষেত্রে অস্ত্র ধরেন নাই। তিনি মূর্ত্তিমান মানসিক শক্তি, বাহুবলের আশ্রয় লইবেন না। তাঁহার অভীষ্ট, পৃথিবীর রাজকুল ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, একা পাণ্ডব পৃথিবীশ্বর থাকেন; স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয়ের নিধন না হইলে তাহা ঘটে না। যিনি ঈশ্বরাবতার বলিয়া কল্পিত, তিনি, স্বয়ং রণে প্রবৃত্ত হইলে, যে পক্ষাবলম্বন করিবেন, সেই পক্ষের সম্পূর্ণ রক্ষা সম্ভাবনা। কিন্তু তাহা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। কেবল পাণ্ডবদিগকে একেশ্বর করাও তাঁহার অভীষ্ঠ নহে। ভারতবর্ষের ঐক্য তাঁহার উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষ তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত; খণ্ডে খণ্ডে এক একটী ক্ষুদ্র রাজা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণ পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া পরস্পরকে ক্ষীণ করিত, ভারতবর্ষ অবিরত সমরানলে দগ্ধ হইতে থাকিত। শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন যে, এই সসাগরা ভারত একচ্ছত্রাধীন না হইলে ভারতের শান্তি নাই; শান্তি ভিন্ন লোকের রক্ষা নাই; উন্নতি নাই। অতএব এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরস্পর বিদ্বেষী রাজগণকে প্রথমে ধ্বংস করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই ভারতবর্ষ একায়ত্ত, শান্ত, এবং উন্নত হইবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাহারা পরস্পরের অস্ত্রে পরস্পরে নিহত হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইল। ইহারই পৌরাণিক নাম পৃথিবীর ভারমোচন। শ্রীকৃষ্ণ, স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া, এক পক্ষের রক্ষা চেষ্টা করিয়া, কেন সে উদ্দেশ্যের বিঘ্ন করিবেন? তিনি বিনা অস্ত্রধারণে, অর্জ্জুনের রথে বসিয়া, ভারত রাজকুলের ধ্বংস সিদ্ধ করিলেন।

এইরূপ, মহাভারতীয় কৃষ্ণচরিত্র যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই তাহাতে এই ক্রূরকর্ম্মা দূরদর্শী রাজনীতি বিশারদের লক্ষণ সকল দেখা যাইবে। তাহাতে বিলাসপ্রিয়তার লেশমাত্র নাই—

গোপবালকের চিহ্ন মাত্র নাই। অতএব তেমন রাজনীতিজ্ঞ, সমাজ-নীতিজ্ঞ, রাজন্যবর্গ ও সমাজ পূজিত কৃষ্ণ যে সামান্যা, প্রণয়োন্মাদ-গ্রস্তা, গোপবালা রাধিকার প্রেমে উন্মত্ত হইবেন, ইহা নিতান্তই অসঙ্গত ও স্বভাববিরুদ্ধ। মহাভারতে ব্রজলীলা বা গোপবালা রাধিকার উল্লেখ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভাগবতে ব্রজলীলার বিস্তারিত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবতের দশম স্কন্ধ সমস্তই এই ব্রজলীলা।

এই যুগের প্রথমাবস্থায় আর্য্যগণ ভৌতিক শক্তি প্রতিমূর্ত্তি দেব দেবীগণের মূলস্বরূপ একমাত্র ঈশ্বরকে দেখিতে পাইয়াছেন। এবং এই একেশ্বর তত্ত্ব লইয়া ঘোর আন্দোলন করিয়াছেন। সাংখ্য, পাতঞ্জল, চার্ব্বাক আদি দর্শন, এবং বৌদ্ধ ও জৈন মতের আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে। এখন সমাজে নানা মুনির নানা মত বিস্তারিত হইয়াছে, কে কাহার কথা শুনিবে, তাহার স্থিরতা নাই। এই কারণ বশতঃই সাধারণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম বিশ্বাস শিথিল হইতেছিল। বিশ্বাস ব্যতিরেকে ধর্ম্মে আস্থা অসম্ভব। এই সময়ে ভারতীয়গণের অধিকাংশ বৌদ্ধ মতাবলম্বী হইলেন। পৌরাণিক বা বৈদিক ধর্ম্মে অল্প লোকেরই আস্থা রহিল; ফলতঃ হিন্দু ধর্ম্মের তখন সমূহ বিপদ। এই বিপন্ন অবস্থা হইতে হিন্দু ধর্ম্মের উদ্ধার হেতু ভাগবতকার কৃত সংকল্প হইলেন। এখন দর্শন শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা, দর্শনের বড় আদর, যাহাতে দর্শন নাই, তাহার আদরই নাই। অথচ শ্রীমদ্ভাগবতকার এই সময়ে কাব্য প্রণয়নে উদ্যুক্ত, সেই কাব্যে সমাজ সংস্করণ ও হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। এমত সময়ে দর্শন ব্যতিরেকে কাব্যের উদ্দেশ্য সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। এই নিমিত্তই, কবি একাধারে কাব্য ও দর্শন সংস্থাপন করিলেন। কাব্য ও দর্শন একাধারে রূপকে মিশ্রিত থাকায়, ভাগবতের ভাবার্থবোধ কিছু দুরূহ। যাহা হউক, ভাগবত রচয়িতা এক

জন দার্শনিক ছিলেন, দর্শনের সাহায্যে তিনি কাব্য প্রণয়ন করেন; তাঁহার কাব্যস্থ দর্শনভাগ রূপকে আবৃত ও সাধারণ চক্ষে অলক্ষিত। বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতিপন্ন হয় যে, সাংখ্যাকার ভাগবত রচয়িতার অগ্রবর্ত্তী। সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ ও তদুভয়ের সংযোগ বিয়োগই ভাগবতের মূলমন্ত্র। ভাগবতকারের সৃষ্ট কৃষ্ণ জীবনীর ব্রজলীলা ভাগে এই প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ বিয়োগ ভিন্ন আর কোন সদর্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। রাধাকৃষ্ণের প্রেম প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ মাত্র। ১ পাঠক স্মরণ রাখিবেন, আমরা বলিলাম রাধাকৃষ্ণের 'প্রেম' প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ; তাঁহাদিগের মিলন, যে মিলনে জয়দেব আনন্দসাগরে ভাসিয়াছেন, অথবা তাঁহাদের 'বিচ্ছেদ', যে বিচ্ছেদে বিদ্যাপতির অন্তর কাঁদিয়াছে, সে 'মিলন বিচ্ছেদ, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ 'বিয়োগ' নহে। এক্ষণে সাংখ্যকার মহাবীশক্তি সম্পন্ন কপিল প্রকৃতি পুরুষ আখ্যায় কি বুঝাইয়াছেন, পাঠকের তাহা বোধগম্য হওয়া উচিত। কপিল এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; আত্মা ও জড়-পদার্থ। আমি বলিলে আমার আত্মা, তুমি বলিলে তোমার আত্মা বুঝায়। কপিল এই আত্মাকেই পুরুষ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এবং আত্মা ভিন্ন সংসারের আর সমস্ত জড়পদার্থ, সাংখ্য এই জড়পদার্থ সমূহকে প্রকৃতি নামে আখ্যাত করিয়াছেন। সাংখ্যের মতে সংসার চিরদুঃখময়।

আত্মা, আধ্যাত্মিক, আধি-ভৌতিক, ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখে চিরপীড়িত। আমরা সংসারে যে অল্প সুখ পাই, সে সুখ উপভোগার্থে প্রমত্ত হওয়া, কোন মতেই উচিত নহে। সাংখ্যের মতে

১ পাঠক, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন কৃত বেদ বিষয়ে দার্শনিকদিগের মত ও চার্ব্বাক দর্শনের সমালোচনা দেখ।

"অসঙ্গোয়ংপুরুষঃ" পুরুষ সঙ্গ রহিত, কাহারও সহিত মিলিত নহে। এই অবস্থায় আত্মা কোন দুঃখ ভোগ করেন না। কিন্তু প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইলেই, তাঁহাকে দুঃখ ভার বহন করিতে হয়। আত্মা যতকাল দেহবিচ্যুতে থাকে, ততকাল তাহার দুঃখ নাই। দেহ পরিগ্রহ করিয়া মাতৃগর্ভ হইতে সংসারে পতিত হইয়াই যে ক্রন্দন করিয়াছে, যতদিন আত্মা এ দেহ বিচ্যুত না হইবে, ততদিন এ সংসারে আত্মার সে ক্রন্দন আর থাকিবে না। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, যে ভাগবতের কৃষ্ণরাধিকার প্রেম এই প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ; প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে দুঃখের উৎপত্তি; এই জন্যই ভাগবতকার প্রকৃতিরূপা রাধিকাকে পরস্ত্রী করিয়াছেন ও পুরুষ স্বরূপ কৃষ্ণকে পরস্ত্রীর অস্বাভাবিক ও অবিশুদ্ধ প্রণয়ের ভিখারি করিয়াছেন। ২। এ অপবিত্র প্রণয়ের ফল কি? ফল, সদাই "হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি" ভিন্ন আর কিছুই নয়। সর্ব্বদাই বিরহ অনল প্রজ্জ্বলিত, সদাই মনে ভয়, কখন কে প্রণয়ের কথা শুনে, মিলনেও সুখ নাই, মিলনেও ভয়, কখন জটিলা কুটিলা দেখে, কখন আয়ান জানিতে পারিবে; সুখে ও সুখ নাই, এ প্রেম দুঃখের উৎস, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগেই দুঃখের উৎপত্তি। আবার রাধিকা কৃষ্ণের বংশীরবে বিমুগ্ধা ও আত্মবিস্মৃতা। পুরুষ স্বরূপ কৃষ্ণের বংশীর অর্থ কি? বংশীর অর্থ মায়া। এই বংশীরব শুনিয়াই প্রকৃতি আত্মার নিকট মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় অধীন। মায়াবশেই দেহ আত্মাদ্বারা পরিচালিত হয়; এই মায়া বশতঃই জড়পিণ্ড দেহ আত্মার বিচ্ছেদ ভয়ে সদাই

---

২ ভাগবতের মর্ম্ম পরিগ্রহে অসমর্থ হইয়াই বুঝি ডাক্তার বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তদীয় ষড় দর্শন সংবাদে কৃষ্ণকে নন্দদুলাল ও লম্পটের চূড়ামণি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

গোপিনাং তৎ পতিনাঞ্চ সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেহিনাং।
যোন্তশ্চরতি সোহধ্যক্ষ এব ক্রীড়ন দেহ ভাক্॥

বন্দ্যোমহাশয় ইহার কিঅর্থ করেন?

ভীত; এই মায়ার সুললিত গানে মুগ্ধ হইয়াই প্রকৃতি (দেহ) নয়জন সখীর সহিত (নয় ইন্দ্রিয়দ্বার রূপ নবনারী) আত্মার সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত। পাঠক এক্ষণে ভাগবতকারের কৃষ্ণরাধিকার প্রেম ও কৃষ্ণের বংশীধ্বনির অর্থ কি, তাহা বোধ হয় বুঝিলেন। কৃষ্ণ এস্থলে পরম পুরুষ, বা পরম আত্মা। গো—পাল কৃষ্ণের বেনুরব, না শুনিলে তৃণাদি ভক্ষণ না করিয়া ঊর্দ্ধমুখে থাকিত, ও বেনুর সুললিত রব শুনিলে সুস্থমনে চরিত। ইহার অর্থ, জীব মাত্রেই মায়ার বশীভূত।

আর একটী বিষয় বস্ত্রহরণ, এটীও রূপক। কোন সময় কাত্যায়ণী পূজার পরে গোপীনীরা উলঙ্গ হইয়া অবভৃত স্নান করিতেছিল, কৃষ্ণ হঠাৎ তাহা দেখিতে পাইয়া, এই অধর্ম্মকর কার্য্যের শাস্তি স্বরূপ তাহাদের বস্ত্র গুলি গ্রহণ করিলেন, পরে গোপিনীদিগের স্তবে মুগ্ধ হইয়া বস্ত্রগুলি প্রত্যর্পণ করিলেন। প্রকৃত অর্থ এই—গোপিনীরা ভক্ত বা জীবত্মা, কৃষ্ণ সাংখ্যের পুরুষ বা পরমাত্মা। ভক্তেরা যখন ঈশ্বর দত্ত পুণ্য বস্ত্র ত্যাগ করতঃ পাপাচরণ করে, তখন তাহারা উলঙ্গ অর্থাৎ পাপী? এস্থলে বস্ত্র,—পুণ্য। আর পাপ—উলঙ্গতা, গোপিনীরা পুণ্যরূপ বস্ত্র ত্যাগ করতঃ পাপসাগরে ক্রীড়া করিতেছিল, যেই পাপজ্ঞান হইল, অমনি পাপ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের শরণাগত হইল, আশ্রিতবৎসল ঈশ্বর অনুতপ্ত পাপীকে ত্যাগ করেন না, তিনি অমনি উলঙ্গতা অর্থাৎ পাপ মোচন করিয়া পুণ্যবস্ত্রে আচ্ছাদিত করিলেন, গোপিনীরা বলিতেছেন "হে কৃষ্ণ! তুমি নন্দ নন্দন নহ। তুমি আমাদের আত্মার পরমাত্মা" এখন বস্ত্র হরণের রহস্য বুঝিলে? ব্রজলীলা আত্মার ইতিহাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভাগবতের পরবর্ত্তী গ্রন্থকর্ত্তাগণ ঐ ব্রজলীলা ভাগকে ক্রমে রঞ্জিত, ও অতিরঞ্জিত করিয়াছেন। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণান্তর্গত মুক্তাফল নামক গ্রন্থে "কৃষ্ণ কালীর" বর্ণনা আছে। ভক্ত বৈষ্ণবগণের সদ্‌জ্ঞান সঞ্চারার্থ, বোধ হয়, মুক্তাফল প্রণেতা বৈষ্ণবদিগের ভক্তির প্রধান আধারকে শক্তি-

মূর্ত্তিতে সাজাইয়াছেন। মুক্তাফল রচয়িতা ভাগবতের বংশীধারী সুললিত হাস্যমুখ শান্তমূর্ত্তি কৃষ্ণকে "অতিবিস্তারবদনা" অসিধারিণী, অট্টহাসিনী ভয়ঙ্করীরূপে সাজাইয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাতেও ভাগবতকারের সেই রূপক মণ্ডিত অর্থের বিপর্য্যয় ঘটে নাই। ভাগবতের কৃষ্ণ, সাংখ্যের ছায়া লইয়া বিরচিত। কৃষ্ণকালীর আয়ান—ধর্ম্মজ্ঞান; জটিলা কুটিলা মানস ও বিবেক। অন্তঃকরণ ও বিবেক যখন ধর্ম্মজ্ঞান বা ধর্ম্মের সাহায্য জন্য ধর্ম্মজ্ঞান হইতে স্বাধীন থাকিয়া সংসার কাননের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করে, তখন প্রকৃতিও পুরুষের সমাগম, এবং সংসারময় মায়ার মোহ দেখিতে পায়। এই দৃশ্যে মানস ও বিবেক মায়াময়ী প্রকৃতির, প্রকৃতি দেখিয়া অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞানের সহিত বাস্তব ধর্ম্ম চক্ষে যখন সংসার কাননের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে, তখন ভিন্ন দৃশ্য তাহাদিগের নয়ন সম্মুখীন হয়। তখন মায়াময় মোহন মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে "করাল বদনাং ঘোরাং এবং "নিমগ্না রক্ত নয়না" ভয়ঙ্করী আদ্যাশক্তির প্রতিমূর্ত্তি, দেখিতে পায়। মানস ও বিবেক মিলিত হইয়া সংসারের অন্তঃপ্রদেশ ভাল করিয়া দেখিলে দেখিতে পায়, প্রকৃতি আর মায়ামুগ্ধা নহেন, তিনি ভয়ে, বিস্ময়ে ও ভক্তিতে পরিপ্লুত হইয়া সংসারের আদি কারণ মহাপুরুষের পূজায় নিরতা হইয়াছেন। পুরুষ আর মায়ার সম্মোহন অস্ত্র বীণা বাদনে প্রকৃতির মোহ সম্পাদনে নিযুক্ত নহেন। তৎপরিবর্ত্তে তিনি "সদ্যশ্ছিন্ন শিরঃ খড়্গ বামাদোর্দ্ধ করাম্বুজাং" হইয়া মায়া বিচ্ছেদকারী ঘোর করবাল করে ধারণ করিয়াছেন ও তদ্দ্বারা মায়ার আধার নরনারী মুণ্ডচ্ছেদন করতঃ সরলতাময় সুন্দর বন মালার পরিবর্ত্তে, "কণ্ঠাবসক্ত মুণ্ডালী গলদ্রুধির চর্চ্চিতং" হইয়া রক্তাক্ত অচিরছিন্ন মুণ্ডের মালা গলদেশে দোলাইয়াছেন। আহা! কি সুন্দর দৃশ্য পাঠক দেখুন, কৃষ্ণের যে ঈশ্বরত্ব তাহা কেবল কবির প্রসাদাৎ। আরও বলি কৃষ্ণ কবির ঈশ্বর, কাব্যের ঈশ্বর, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর নহেন। ইতি।

সত্যযুগের আবির্ভাব।

"নীচৈর্গচ্ছত্যু পরিচদশাচক্র নেমিক্রমেণ"—মেঘদূত।

কলিকালের কালরাত্রি বুঝি পোহাইল। পুরাণের ভবিষৎবাণী বুঝি সত্য হয়। শুনিয়াছি কলির অবসানে সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। তাই বা ঠিক হইতে চলিল। সত্যের পর ত্রেতা, ত্রেতার পর দ্বাপর, দ্বাপরের পর কলি। কিন্তু ইহার বিপরীত পর্য্যায়ক্রমে ত সত্যের আবির্ভাব হইবে না। কলির পর আবার দ্বাপর আসিবে না, দ্বাপরের পর আবার ত্রেতা আসিবে না, ত্রেতার পর সত্য আসিবেনা। সত্য—একেবারে কলির পর আসিবে,—এই ভবিষ্যৎবাণী। তাই ত ঘটিয়া আসিতেছে। সত্য যুগের আলোক, সত্যযুগের আভাস ত অনেক দেখা দিয়াছে। সত্যের পর ত্রেতায় অনেক পাপাচার ঘটিয়াছিল। ত্রেতার পর দ্বাপরে পৃথিবীতে আরও পাপ প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং আমরা ত্রেতা ও দ্বাপরের গ্রন্থাদিতে যে সকল আচার ব্যবহারের কথা পড়িয়া থাকি, তাহার অধিকাংশই পাপাচার। আবার কলিতে সেই সকল পাপাচার অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং হিন্দুসমাজে যে সকল আচার ব্যবহার কলির প্রারম্ভ কাল হইতে চলিত আছে, তাহা যুগধর্ম্মানুসারে সমুদায় পাপাচার। সে সমস্তকে পাপাচার না বলিলে তবে আর কলিযুগমাহাত্ম্য কোথায় রহিল? সুতরাং বর্ত্তমান কালের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে যে সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল, তাহা হিন্দুধর্ম্মানুসারেই পাপাচার। সে সকল যদি পাপাচার হয়, তবে তাহার বিপরীত আচারাদি অবশ্য সদাচার ও ধর্ম্মাচার হইবে। বর্ত্তমান কালে হিন্দু 'সমাজে যে সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত হইতেছে, তাহা পূর্ব্বকালের আচার ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিপরীত। এখন অনেকটা একাকার হইবার উপক্রম হইতেছে। শ্বেতাঙ্গ অবতার কল্কিরূপে ভারতের পূর্ব্বদিক

হইতে উদয় হইয়া ক্রমে ভারতময় আপন প্রভুত্ব বিস্তারিত করিয়াছেন। ইনিই বোধ হয় বিষ্ণুর দশম অবতার। এখন জলে শীলা ও লৌহ ভাসিতেছে। ছয় মাসের পথ ছয় দিনে যাওয়া যাইতেছে। এক বৎসরে যে সম্বাদ পাওয়া দুষ্কর, তাহা এক মুহূর্ত্তে জাওয়া যাইতেছে। এখন আর শুঁড়ি, হাঁড়ি, ব্রাহ্মণ ভেদ নাই। ব্রাহ্মণ নির্ব্বিঘ্নে শুঁড়ির জল খাইতেছে। জাতিভেদ উঠিয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণে যজ্ঞোপবীত ফেলিয়া দিতেছে। অভক্ষ্য ভক্ষণে ব্রাহ্মণেরও আর বিঘ্ন নাই। স্ত্রীজাতির, সাহস বাড়িয়াছে। তাহারা পুরুষের ঘাড়ের উপর চড়িতেছে। লোকের অন্তর্জগতের কোণে কি এক আলোক দেখা দিয়াছে, সে দিক ফরসা হইতেছে। ইহা কি সত্যযুগের আভাস নয়? কলিকাল কি অবসান-প্রায় নয়? তবে কেন টিকিকাটা টুলো ব্রাহ্মণেরা এক্ষণকার ছেলেদের বেল্লিক, বেয়াড়া কলির চেলা বলে? তাহারাও কি কলির ব্রাহ্মণ নহে? তাহারাও কি সত্যযুগ আনিবার জন্য অনেকটা উদ্যোগী হয় নাই? বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে এখন সত্যযুগের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান কালের লোকেরা সত্যযুগের মশালজি,—ভবিষ্য পুণ্যযুগের বেলদার—আমি এই কথা অনেক রকমে সাব্যস্ত করিতে পারি।

১ দফা। ঐ দেখ, "এখন চারি দিকে ধর্ম্মের ঢোল বাজিয়া উঠিয়াছে। সকল কাগজেই এখন ধর্ম্মের ডাক ডাকিয়া উঠিয়াছে। এখন লোকে ধর্ম্ম বই আর কিছুই জানে না। এখনকার লোকে ধর্ম্মের বিশাল ও মহতী মূর্ত্তি, কত স্তরের ভিতর স্তর ভেদ করিয়া বাহির করিয়াছে। বাহির করিয়া আনন্দে ডাকিয়া উঠিয়াছে "এখন যুগান্তর উপস্থিত।" এ যুগান্তর কি?—ধর্ম্মের যুগ—যে যুগ কলির পর উদয় হইবে। অনেক কষ্টে তাঁহারা এই ধর্ম্মালোক বাহির করিয়াছেন। বাহির করিয়াছেন "বাঙ্গালীর সামান্য তাসের খেলায়,

(সামান্য প্রাবৃত্তে) নব-মনুসংহিতার বর্ণাশ্রম ও গৃহাশ্রম তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে।” এখন লোকের অন্তর্দৃষ্টি ফুটিয়া গিয়াছে। তাহারা ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল বাহির করিতে পারিতেছে। অনেক স্তরের নীচে আগে যে ধর্ম্মদেবী অধিষ্ঠিতা ছিলেন, এখন সেই স্তর ভেদ করিয়া সেই ফেরারি ধর্ম্মকে বাহির করা হইয়াছে, এবং কলির ভগ্নাবশেষের উপর তাঁহার সিংহাসন এক জাঁকাল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। পলাণ্ডুর কোষের মধ্যে যেমন শাঁস থাকে ধর্ম্ম সেইরূপ ছিলেন। লোকে এখন সেই কোষ ছাড়াইয়া ধর্ম্মকে বাহির করিয়াছে। “জাপানের বাক্সর মত, পলাণ্ডু কোষের মত” আধ্যাত্মিক জগতের স্তরের মধ্যে অনেক স্তর ভেদ করিয়া তবে ধর্ম্মের প্রকৃত মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে। আর ভাবনা কি। এতকাল যে ধর্ম্ম ছিল সে ধর্ম্ম নহে, এইবারে খাঁটি ধর্ম্ম বাহির হইয়াছে, এইবারে পাপ তাপ দূরে গিয়া সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে।

২ দফা। এখন লোকের দিব্য জ্ঞান জন্মিয়াছে। প্রাচীনকালে লোক পাপী ছিল কি না, তাই তাহাদিগকে অনেক যোগ সাধনা করিয়া যে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইত, এখন সত্যযুগের নিকটবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত পুণ্যবান প্রাণীগণের সেই ধর্ম্মজ্ঞান অনেকটা সহজে লব্ধ হইতেছে। লোকে এখন সহজেই বুঝিয়াছে, এই জগৎই ঈশ্বর। জগৎ হইতে পৃথক্ যে ঈশ্বর, এবং এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা স্বরূপ একজন পৃথক্ পুরুষ যে ঈশ্বর, সে ঈশ্বরভাব ইউরোপীয় শ্বেত জাতিদের ভ্রান্তি মাত্র। হিন্দু ধর্ম্মের যে ঈশ্বর তাই ঠিক। কারণ, এদেশে ত্রেতা, দ্বাপর, ও কলির—এই তিন যুগেরই লিখিত পড়িত শাস্ত্র আছে, এই শাস্ত্র মধ্যে সত্যযুগে মনুষ্যের যেরূপ ঈশ্বরজ্ঞান ছিল, তাহা বরাবর রক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের ঈশ্বরজ্ঞানকেই প্রকৃতঈশ্বরজ্ঞান বলিতে হইবে। তাহা প্রকৃত সত্যযুগের ভাব। তাহা বরাবর যুগে যুগে চলিয়া আসিয়া এখনকার কালে, যখন সত্যযুগ

অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তখন একেবারে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। যখন এই ভাব প্রস্ফুটিত হইতেছে, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, সত্যযুগ আগতপ্রায়। এই ঈশ্বরজ্ঞান কি ?—না এই জগৎই ঈশ্বর। ধর্ম্মের চন্দ্র চূড়ামণি তাঁহার "দুর্গোৎসব" নামক বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা গত ৫ই শ্রাবণ তারিখের "বঙ্গবাসী" হইতে উদ্ধৃত হইল।

"যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভক্ত, সেই জগৎ প্রসূতিকে আপন হইতে বিভিন্ন দেখে, আপনার এবং ঈশ্বরের অভেদ উপলব্ধি করিতে সমর্থ না হয়, যতক্ষণ উপাসক আপনাকেই ঈশ্বরস্বরূপ না দেখে, ততক্ষণ সে তত্ত্বজ্ঞানবিহীন—সে পশু।" আহা! বাছার কি চমৎকার শাস্ত্রজ্ঞান।

যখন মনুষ্যের এই ঈশ্বর ও আত্মতত্ত্ব জ্ঞান সহজে জন্মিয়াছে; এই তন্ময়জ্ঞান জন্মিয়াছে, তখন আর ভাবনা কি? কারণ, এই জগৎ যদি ঈশ্বর হয়, তবে আর পাপ, তাপ, কিছুই থাকে না, তবে সকলই ঈশ্বরময়। তবে, আমি ঈশ্বর, তুমি ঈশ্বর, পণ্ডিত ঈশ্বর, মূর্খ ঈশ্বর, সেয়ানা ঈশ্বর, আহাম্মুখ ঈশ্বর, সাধু ঈশ্বর, চোর ঈশ্বর, রাজা ঈশ্বর, প্রজা ঈশ্বর, চাষা হাড়ি ডোম সকলই ঈশ্বর। গাছ, পালা, পোকা, মাকড়, গরু বাছুর, বাঁদর, হনুমান, গুণবান সকলই ঈশ্বর। ধান, চাউল, কাষ্ঠ, লাঠি, আসন, বসন, ঘটি, বাটি, সকলই ঈশ্বর। আমি যাহা লিখিতেছি, এ সমস্ত ঈশ্বরবাক্য, এজন্য সত্য। তুমি যাহা প্রতিবাদে লিখিয়াছ তাহাও ঈশ্বরবাক্য, সুতরাং সত্য। অতএব মিথ্যা সত্য সব এক হইয়া গেল। তবে আর সত্যযুগের কসুর কি? আবার দেখ, ঐ যে শ্বেতাঙ্গ জুতা দিয়া তোমাকে মারিলেন, তোমাকে জ্ঞান করিতে হইবে, এ এক জন ঈশ্বর,—ঈশ্বর দিয়া তোমাকে ঈশ্বরত্ব পাওয়াইয়া দিলেন; "নায়ং হন্তি ন হন্যতে" সুতরাং হত্যাকাণ্ডে দোষ নাই। যখন ঘুসি ঘাড়ে পড়িতেছে, তখন জ্ঞান করিতে হইবে, ঈশ্বর ঘাড়ে পড়িতেছেন। সুতরাং পৃথিবীতে পাপ তাপ, আর কিছু থাকে না। জুয়াচুরি আবার কি?

তাহা ত এক জন ঈশ্বরের কার্য্য মাত্র। "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোঽস্মি"। কাজে কাজেই, আইন আদালত সব উঠিয়া যাইতেছে। আহা! সত্যযুগ সোণারকাল ছিল। তখন বিষ্ঠা চন্দনে সমান জ্ঞান ছিল। তাই ত আবার হবে! লোকের ত সেইরূপ দিব্যজ্ঞান জন্মিয়া আসিতেছে। এখন যে লোকে গরু ছাগল বলে, তাহা কেবল ঈশ্বরকে চিনিবার জন্য। নহিলে আমি যদি বলি, পথ দিয়া ঈশ্বর চলিয়া যাইতেছে, তুমি কি বুঝিবে? তুমি কি বুঝিবে একটা ছাগল চলিয়া যাইতেছে? নবজীবনের লেখকের মত তোমার যখন দিব্যজ্ঞান জন্মিবে, যখন প্রকৃষ্টরূপে সত্যযুগ আসিয়া পড়িবে, তখন তুমি সেই ছাগলই বুঝিতে পারিবে। ক্রমে যখন এই মত লোকে খুব হজম করিতে শিখিবে, তখন লোকের তত্ত্বজ্ঞান জাগিয়া উঠিবে। তখন জ্ঞানচক্ষুতে চাহিয়াই দেখিতে পাইবে, জগন্ময় ঈশ্বর। এককালে জগৎ যে ঈশ্বরে ছাইয়া যাইবে, তাহার এই সূত্রপাত হইয়াছে। পাপী, তাপী, সবে আশ্বাসিত হও। সত্যযুগের আলো ধিকি ধিকি আসিতেছে। ঐ দেখ "নবজীবন" উদয় হইতেছে।

৩ দফা। লোকের যখন এমন দিব্যজ্ঞান জন্মিতেছে, তখন আর কৃত্রিম দেব দেবতা কি টাঁকে? জীয়ন্ত ঈশ্বর সকল যখন বেড়াইতে লাগিল, তখন কি আর সেকালের কুমারটুলির খড়ের দেবতারা কল্‌কে পান? এই জীয়ন্ত ঈশ্বরেরা সব কোষ খুলিয়া দেখিতে পাইলেন,—ওরে দেব দেবতাগুলা কবির কল্পনা বই আর কিছুই নয়! এই কবির কল্পনা গুলা এত দিন জুয়াচুরি করিয়া আমাদের ঠকিয়া খাইয়াছে বটে! তবে ইহাদের ভুর ভাঙ্গা যাক্। এই ভাবিয়া জীয়ন্ত ঈশ্বরেরা বলিলেন যে "ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর * * * বৈজ্ঞানিক তিনটী জড়শক্তির ভাব" মাত্র। অনেক স্থর ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছে যে, হর পার্ব্বতী বাস্তবিক ঠাকুর নহে, তাহা "অনন্ত জগতের অনন্ত কালের পুরুষ প্রকৃতি" মাত্র। রাধাশ্যাম যে ব্রজে

লীলা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক কিছু নহে। তাহা কবির কল্পনা মাত্র। সেই কল্পনায় কবি ঈশ্বর প্রেমের "মধুর" ভাব দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণরাধাও প্রকৃতি পুরুষের কল্পনামাত্র। তাঁহারা বাস্তবিক ঠাকুর নন। হিন্দুরা বাঁচিয়া গেল; জন্মাষ্টমীর উপবাসের দায় হইতে মুক্ত হইয়া গেল। ধর্ম্মের চূড়ামণি স্থির করিয়াছেন, শাক্তদের বড় আদরের যে কালীমূর্ত্তি এবং দুর্গামূর্ত্তি তাহাও কবির কল্পনা মাত্র। তিনি সেই মূর্ত্তির রূপক ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। যাক্, আর মেয়ে গুলা কালীঘাট যাইতে দৌড়াদৌড়ি করিবে না। শম্ভু, নিশম্ভু এবং মহিষাসুর বধের পালাটা বুঝাইতে পারিলে হিন্দুরা রেহাই পায়। আর কালীঘাট যাবার খরচ যোগাইতে পারে না। দশ মহাবিদ্যার রূপকও বাহির হইয়া গিয়াছে। দুর্গোৎসবের ফুলবাবু কার্ত্তিকেয়, গণেশ প্রভৃতির রূপকও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দেব দেবতা গুলার হাত হতে রক্ষা পাওয়া গেল, না অল্প রোজকারী বাঙ্গালীরা বেঁচে গেল। নিত্য নিত্য ঠাকুরের মানসিক ও পূজা দিবার খরচটা ক্রমে উঠিয়া যাইবার সূত্রপাত হইতেছে। কবে এই সকল মত হিন্দুদের মেয়ে মহলে ও গলায় পৈতা বামুনদের মনে সেঁদোবে, এখন তাহারই জন্য ব্যস্ত হওয়া গিয়াছে। আমিত যাকে পাই তাকেই এক্ষণকার কোষ-বিনির্গত ধর্ম্ম আলোচনায় মাতিতে বলি। যখন প্রমাণ হইয়া যাইতেছে যে, এসমস্ত কবির কল্পনা বই আর কিছুই নয়, তখন আর সত্যযুগ আসিবার বিলম্ব কি! এত দিনে হিন্দুধর্ম্ম দোবারা চিনি হইবে।

৪ দফা। শুধু দেব দেবতা উঠিয়া যাইতেছে না, শাস্ত্রশাসনও উঠিয়া যাইবার যোগাড় হইয়াছে। এত কাল এত শাস্ত্রবেত্তা বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মকথা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করেন নাই। এক্ষণে তাঁহাদের বিধানের মর্ম্মভেদ হইতে চলিল। এখন শাসন স্থানে যুক্তি আসিয়া বসিতেছে। শাস্ত্র বিধান

কি জন্য ভাল, কি জন্য পালনীয় তাহার যুক্তি বাহির হইতেছে। সুতরাং এখন যুক্তিই প্রবলা হইয়া দাঁড়াইতেছে।

এক্ষণে আমাদের "ধর্ম্মের চূড়ামণি" এবং "নবজীবনের" লেখকেরা সেই শাস্ত্র শাসনের যুক্তি ও মর্ম্ম বাহির করিতে গিয়াছেন। শাস্ত্রটা যুক্তি বলিয়া যখন সামান্য লোকেরও বিচার্য্য হইয়া পড়িবে, তখনই জানিব যে প্রকৃত রূপে সত্যযুগের আবির্ভাব হইতেছে। এখনও কিছু দেরি আছে। সাধারণ লোকে,—যত মূর্খ, ও নিরক্ষর এবং আহাম্মুক লোকে—এখনও এই শাস্ত্র বিধান সকলকে দেবাজ্ঞা বলিয়া মানে,—ঐ ত হয়েচে প্যাঁচ। ইহারা বুঝিলেই হইল যে, শাস্ত্রটা যুক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। চূড়ামণি মহাশয় তজ্জন্য বিলক্ষণ উদ্যোগী হইয়াছেন। ইনি একজন যথার্থ সত্যযুগের রাস্তাবন্ধি মজুর। তাঁহার মজুরি দিব এমত পয়সা আমাদের নাই। তবে যদি তিনি মেহেরবানি করিয়া আমাদের রঘুনন্দন পত্র উপহার লয়েন, আমরা কৃতার্থ হই। ধন্য, স্বদেশহিতৈষী চন্দ্র চূড়ামণি মহাশয়! তুমিই যথার্থ শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া অমৃত লাভ করিয়াছ। লোকে কেন আর শাস্ত্রের লোণা-জলে পড়িয়া থাকে। তুমি তাহাদিগকে যুক্তির অমৃত সিঞ্চন কর; তাহাদের দেবভক্তি উড়িয়া যাউক! তাহারা দেবভক্তির সিংহাসনে তোমাকে বা যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করুক, এবং ঢেকির কচকচি করিতে করিতে সত্যযুগের পন্থী হউক! তুমি তাহাদিগকে হাতে ধরিয়া "অসতোমা সদ্গময়" বকিতে বকিতে অমৃত নিকেতনে লইয়া যাও।

৫ দফা। কলিতে মুনি ঋষিগণের প্রাদুর্ভাব লোপ পাইয়াছিল। সত্যযুগ আসিতেছে কি না, তাই ক্রমে ক্রমে দুই একটি দেখা দিতে-ছেন। মুনিরা যে আসিতেছেন তাঁহাদের লক্ষণেই টের পাওয়া যাইতেছে। মুনিদের একটি লক্ষণ এই "নানা মুনির নানা মত"; অতএব যে সকল লোকের মতভেদ আছে, তাঁহারা নিশ্চয় মুনি। মুনিদের আর একটী লক্ষণ এই :—

মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।

মুনিদিগেরও মতিভ্রম হয়। এই লক্ষণানুসারে বিচার করিলেও এখন অনেক মুনি পাওয়া গিয়া থাকে। যদি কালক্রমে এইরূপ ঋষিতে দেশটা পূরিয়া যায়, তবে আর সত্যযুগ হবার বাকি টা কি থাকে? হায়! সেই কাল কবে উদয় হইবে!

চারি মাস হইল, এক জন গজকণ্ঠ মহাপণ্ডিত বলিয়াছিলেন—

"আমরা একটা তত্ত্ব মনে মনে স্থির করিয়া লই—যথা, এই জগৎ ঈশ্বর সৃষ্ট, এবং ঈশ্বর-নিয়ত; এবং ইহ লোকের ফল, পরলোকে বা জন্মান্তরে ভোগ করিতে হয়।" আর এক জন দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিলেন, "তা নয়—জগৎ ঈশ্বরসৃষ্ট নয়। হিন্দু ভিন্ন আর সকল ধর্ম্মে বলে এজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর, শুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের সার উপদেশ এই যে, জগৎই ঈশ্বর, ঈশ্বর জগৎ হইতে পৃথক নহেন।" চূড়ামণি যে সকল মত প্রচার করিতেছেন, আমাদের বৃদ্ধ বয়সের উপসর্গগ্রস্ত উপন্যাসলেখক ও নব দীক্ষিত হিন্দু সে মতে মত দেন না। সুতরাং যাঁহাদের এত মতভেদ, তাঁহারা নিশ্চই মুনি না হইয়া যান না। আবার যদি মতিভ্রম ধর, সে অংশেও এক জন মুনি দেখা দিতেছেন:—

ধর্ম্মের চূড়ামণি যখন "ঈশ্বর কিং স্বরূপ" নির্ণয় করিতে গেলেন, তখন তিনি স্থির করিলেন যে—

"ব্রহ্ম বা চৈতন্যকে ঈশ্বর বলিতে পারি না।" তিনি আরও বলিয়াছেন:—

"বাস্তবিক তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) ইচ্ছাময়, দয়াময়, শক্তিময়, উত্তাপময়, তেজোময়, বিশুদ্ধ, নির্ম্মল বলাও যা,—আর বৃক্ষময়, কাষ্ঠময়, শিলাময়, মৃত্তিকাময়, খড়ময়, বলাও তাই। কেননা,—ইচ্ছা, জ্ঞান, বৃক্ষ, শিলা, সকলই ত ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত।"

ঈশ্বর কিং স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া ধর্ম্মের চূড়ামণিও ভারি গোলযোগে পড়িয়াছিলেন। শেষে তিনি কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এ বিষয়ে কিছুই সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর নির্ণেয় নহে। বুদ্ধির চিক্‌নাই দেখ!

কিন্তু সাধু লোকেরা খোলা চক্ষের লোক ও ভোলা মহেশ্বর। তাঁহারা কখন কি বলিয়াছেন, তত ঠিক রাখিয়া কথা কহেন না। চূড়ামণি দিন কয়েক পরে আবার যখন বক্তৃতা করিলেন, তখন ঈশ্বরকে সেই ইচ্ছাময়, শক্তিময় প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। কইফিয়ৎ চাহিলে হয় ত বলিতেন, এ বিষয় পরে বুঝাইব। সুতরাং তাঁহার যখন মতিভ্রম ঘটিয়াছে, তখন তিনি এক জন মুনি না হন কেন? তিনিও অবশ্য উনিশ শতাব্দীর একজন মুনি।

৬ দফা। এবারে একটি অকাট্য প্রমাণ দিব। এদেশের লোক বহুকাল হইতে বুঝিয়াছিল, কিন্তু এখন একটু ভাল করিয়া বুঝিতেছে,—অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। অহিংসা ধর্ম্মটা আমাদের দেশে ইতিপুর্ব্বেও লোকে আচরণ করিয়া আসিয়াছে। দেশে রক্তপাত না হয়, এজন্য হিন্দুরা লাগিয়া পড়িয়া ক্লাইব ও সেরাজুদ্দৌলার যুদ্ধবিগ্রহ কেমন কলে কৌশলে মিটাইয়া দিলেন! নেড়েরা বড় রক্তপাত করিত, এজন্য রাজ্যটা ইংরাজ হস্তে যাওয়াই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালীরা ক্লাইবকেই জিতাইয়া দিলেন! শ্বেতাঙ্গদের মুষ্ট্যাঘাতেও প্রাণিবধ হয়, সুতরাং প্রাণিবধ ভয়ে, বাঙ্গালীরা একটি মুষ্ট্যাঘাতও করিতে জানে না। সে দিন শ্রীরামপুরের একজন দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানকে শ্বেতাঙ্গ পুরুষ কর্ণার্দ্ধে ও গ্রীবার্দ্ধে সাকুল্যে পূর্ণার্দ্ধচন্দ্রে বিতাড়িত, বিদ্ধস্ত, ও বিঘূর্ণিত করিয়া দিল—ভাগ্যে প্রাণে মারে নাই, এত অহিংসা কি আর কোন জাতিতে আছে?

অহিংসা ধর্ম্মটা সে দিন ইলবার্ট বিলের সময় একটু টলমল

করিয়াছিল। যত অর্ব্বাচীন পাদ্রী, তাঁহারাও মূলমন্ত্র ভুলিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। তাই দেখিয়া হিন্দু সমাজের ধূরন্ধরগণ আবার সেই ধর্ম্মটা না হাত ছাড়া হয়, এজন্য তাহার নবজীবন দান করিলেন। ধর্ম্মটাকে একটু চুম্রে লইলেন। শ্যেনকপোতের পালক উল্টাইয়া পাওয়া গিয়াছে যে, সহিষ্ণু না হইলে হিন্দুরা মহৎ হইতে পারিবে না। প্রাচীন ভারত যে এত বড় হইয়াছিল, তাহার সিঁড়ি সহ্যগুণ। অতএব মহত্বের সিঁড়ি, ক্ষমা ও সহ্যগুণ। শ্বেতাঙ্গদের জুতা লাথি কাণমলা যত হজম্ করিতে পারিবে, ততই তাহাদের সহ্যগুণ ও গৌরব, সম্পদ বৃদ্ধি হইবে। অপমান জ্ঞান করা অভিমানীর কর্ম্ম—দাম্ভিকের কার্য্য। দম্ভ ও অভিমান না ত্যাগ করিতে পারিলে বড় হওয়া যায় না। আত্মাদরটা দম্ভেরই কার্য্য। আত্মাদর থাকাটা কিছু নয়। তাই বুঝিয়া কি সে দিন বাঙ্গাল মুন্সেফ গলিয়া পড়িয়া মোমের মত হইয়া সাহেবকে ক্ষমা দিলেন? এস্থলে দেখিতে হইবে, সমর্থবান যে দুর্ব্বলকে ক্ষমা করে তাহার নামই প্রকৃত ক্ষমা। অক্ষমের ক্ষমাকে ভীরুতা বা কাপুরুষতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সোণার কাটি, রূপার কাটি পড়। ঈশাও প্রথমে আততায়ীদিগের কর্ণচ্ছেদ ও অভিভূত করিয়া আপনার ক্ষমতা দেখাইয়া পরে ধরা দিয়াছিলেন। এই জন্য ঈশার এত গৌরব ও মহত্ব। যোহন ১৮।৬।১০ পদ। সত্যযুগে যাইতে হইলে ছয় রিপু্ বশ করিতে হইবে। রাগটা যতই দমন হয়, ততই ভাল। দেশটা উৎসন্ন যাউক না কেন, তাহাতে আমার রাগটা জাগরিত হওয়া বড় দোষের কথা। রাগটা উদ্দীপ্ত হইলেই ত অহিংসা ধর্ম্ম নষ্ট হয়; দেশে মারামারি বাঁধে। অতএব রাগটার একেবারে দমন করাই ভাল, কেবল সহ্যগুণ ধর, সব সহিয়া থাক, তোমাদের আত্মোৎকর্ষ ও মঙ্গল হইবে। পূর্ব্বকালের মুনি ঋষিরা এই রূপ যোগসাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরের হাতে সর্ব্বস্ব দিয়া বনে

গিয়াছিলেন। তবে কেন তোমরা দেশের জন্য এত ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ কর। ধীর হও, শান্ত হও, অহিংসা শিক্ষা কর। এখন এই সমস্ত ধর্ম্মভাবে উদ্বোধিত হইয়া লোকে নবজীবন পাইয়াছে, এবং সাধারণকে নবজীবন দান করিতেছে।

অহিংসা ধর্ম্ম ভাব প্রকৃষ্টরূপে আচরণ করিতে গেলে আহারাদি পরিত্যাগ করা উচিত। ঐ দেখ লোকে যোগ শিক্ষা দিতেছে। এই যোগ সাধন করিতে পারিলেই আহারাদির হাত হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে। চোক বুজিয়া যোগাভ্যাসও কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে তাহার একটু একটু চিহ্ন দেখা দিয়াছে। লোকে প্রকৃত রূপে যোগী হইলে মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া বিনা আহারে কতকাল জড়পিণ্ডবৎ চোক বুজিয়া বসিয়া থাকিবে। তখন অহিংসাধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা সাধন হইবে। সকলেই বৌদ্ধ মূর্ত্তি ধারণ করিবে। বৌদ্ধ দেবতায় পৃথিবী পূরিয়া যাইবে। সত্যযুগ আর কাহার নাম। সেই অহিংসা ধর্ম্ম, সেই যোগের সূত্র পাত হইয়াছে। আমাদিগের রিপু সকলের দমন হইয়া আসিতেছে। রাগ আর নাই বলিলেই হয়, আত্ম মর্য্যাদা ও অভিমান অনেক কাল গিয়াছে। আস্পর্দ্ধা মাত্র আছে। আর কি চাও? এ সকল কি সত্য যুগের গোড়া নয়? এ যদি সত্যযুগের গোড়া না হয়, তবে আমি নাচার। আমি এই ছয় দফা অকাট্য প্রাণ দিয়া বুঝাইলাম যে, সত্যযুগ আসিতেছে। যিনি একান্ত না বুঝিবেন, তাঁহার ইহকালও নাই, পরকালও নাই।

ঘোমটা ও লজ্জা।

" ঝটিতি প্রবিশ গেহং মা বহিস্তিষ্ঠ কান্তে—
গ্রহণ সময় বেলা বর্ত্ততে শীতরশ্মে।
অয়ি সুবিমল কান্তিং বীক্ষ্য নূনং স রাহু—
গ্রসতি তবমুখেন্দুং পূর্ণ চন্দ্রং বিহায়। "

কালিদাস।

এ দেশে ঘোমটার ব্যবহার কত কাল তাহার যুক্তিযুক্ত সদুত্তর নাই। তবে অনেকের বিশ্বাস যে, হিন্দু রাজত্ব সময়ে ভারত মহিলাগণের মুখ মণ্ডল ঘোমটা দ্বারা আবরিত হয় নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস, যে অবধি ভারতে যবনের অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছিল, তখন হইতেই ভারত ললনার মুখমণ্ডলে ঘোমটার সৃষ্টি হইয়াছে। পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলেন, ঘোমটা হিন্দু ধর্ম্ম ও পৌরাণিক গৌরব রক্ষার প্রধান উপকরণ। এ কথায় আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আবার সেই দুঃখের সঙ্গে হাসিও আসিয়া উপস্থিত হয়। হিন্দু-ধর্ম্ম কি আজ, হিন্দু ললনার ঘোমটার কোণে লুক্কায়িত রহিয়াছে? অথবা কি ঘোমটা লজ্জার অনুরোধে? যিনি যাহাই বুঝুন না কেন, আমরা বহু চিন্তা করিয়াও ঘোমটার অনন্ত চাতুরীর অন্ত পাই নাই। যাহা দেব বুদ্ধির অগম্য তাহার মর্ম্ম মানবে কি বুঝিবে? বিলাতের বিবিরা অর্দ্ধ বিবসনা হইয়া অজ্ঞাত চরিত্র পুরুষের সহিত প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য স্থলে তালে তালে নাচিতে গাহিতে পারেন, গুপ্ত স্নান হ্রদে প্রবিষ্ট হইয়া মুক্ত কেশী দিগম্বরী বেশে অকাতরে গা ঢালিয়া দিয়া যাহার তাহার সহিত জল ক্রীড়া করিতে পারেন, পূর্ব্ব রাগের পুষ্পিত ছলনায় যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে এবং যাহার সহিত ইচ্ছা তাহার সহিত মদমত্তমাতঙ্গিনীর ন্যায় প্রণয়ের খেলা খেলিতে পারেন, পরম সুন্দর বাঙ্গালী খ্রীষ্টান যুবকের সহিত নির্জ্জনে গুপ্ত রহস্যের অভিনয়

করিতে পারেন, বিচার পতির নিকট দাঁড়াইয়া যুবকের আধ্যাত্মিক মা হইয়া এক আনা সম্মান পাইতে পারেন, আবার অশ্বারূঢ়া উগ্র চণ্ডার মত অশ্বপৃষ্ঠে সমারূঢ়া হইয়া পরিচিত অপরিচিত পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনায়াসে প্রধাবিত হইতে পারেন। ইংরাজ অনুকরণে জেনানা শিক্ষায় বঙ্গীয় খ্রীষ্টান রমণীরা কেহ কেহ কামেজগাত্রে ছত্র হস্তে দু চার গণ্ডা চাবি ঝুলাইয়া মোহিনী বেশে পথে পথে বেড়াইতে পারেন,ইহার কিছুতেই তাহাদিগের লজ্জা বিনষ্ট হইয়া যায় না। কিন্তু চরণ তলের আবরণ ক্ষণকালের তরেও উন্মোচন করিলে অথবা কাহার অধরে তাম্বুল রাগের রেখা মাত্র দেখিলেই, তাঁহারা লজ্জায় অধীর হইয়া মরিয়া যান। হিন্দুদিগের মধ্যেও লজ্জার এ রূপ রসবৈচিত্র এবং সর্ব্বত্রই সেই বিচিত্রতার অসংখ্য উদাহরণ দৃষ্ট হয়। প্রিয়বালার শাশুড়ী বড় লজ্জাশীলা,সকলেই বলে, তিনি লজ্জার শাসনে জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ সহোদরেরও মুখ পানে চাহিয়া কথা কহিতে সমর্থ হন না; এবং তাঁহার স্বামীর সহিত কোন দিন কথা কহিয়াছেন কি না, তাহা কেহ জানেনা। কুলকামিনী নির্লজ্জ হইলে তাঁহার মনে এমনই ঘৃণা ও হ্রীযন্ত্রণা উপস্থিত হয় যে, যদি তাঁহার পুত্রবধূটি, সীমন্তে সিঁদূর দেওয়ার অভিলাষে দর্পণের সম্মুখে মুখের ঘোমটা ফেলিয়া বসে,তাহা হইলেই তিনি শিরে শত বার করাঘাত করেন, এবং কলির পাপাচারে আর বেহ্ম ও খিষ্টানদের লেখা পড়া পাপ চর্চ্চায় পৃথিবীর লজ্জা শরম যে একবারে প্রক্ষালিত হইয়া গেল, ইহা চিন্তা করিয়া অতি গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বিলাপ করিতে থাকেন। কিন্তু বিবাহের পাকস্পর্শে জন সাধারণের মধ্যে পরিবেশনের সময় শান্তিপুরের দিগম্বরী পরিয়া বাহির হইতে তাঁহার কিছু মাত্র লজ্জা বা কষ্টবোধ হয় না। ভৃত্যাদির উপর পুরুষের মত তাড়না ও তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে তাঁহার জিহ্বায় একটুও বাধেনা, এবং খিড়কির ঘাটে কি ছাদের উপর হাট মিলাইয়া বসিতে, এই আধ বৃদ্ধ বয়সেও বাসর গৃহে রাই রঙ্গিণী সাজিতে,

কৌতুক প্রসঙ্গে কথার ছড়া কাটিতে, এবং বাসী বিবাহের কাদা খেলা লইয়া কমল কাননে মত্ত করিণীর ন্যায় প্রমত্ত ক্রীড়া করিতে তাঁহার চিত্ত কখন কোন রূপ কাতরতা অনুভব করেনা। বাড়ীর বহিঃ প্রাঙ্গণে যখন কবিওয়ালার নৃত্য হয়, তখন তাঁহার কৌতূহল সকলের উপরে। তিনি তখন সমবয়স্কা সখিদিগকে লইয়া সখ করিয়া সখি-সম্বাদ শুনেন, আর যখন লহরীর আরম্ভ হয়, তখন তিনি তিরস্করণীর অন্তরালে শুষ্ক কণ্ঠ চাতকীর ন্যায় তৃষিত ভাবে উপবিষ্টা রহেন।

বিরাজ মোহিনীর পিসিও নিতান্ত লজ্জাবতী। তিনি কিছু পরিমাণে সেকেলে লোক, এখনকার কুৎসিত রীতি নীতি তাঁহার চক্ষে বিষ। ঘরের ঝি বউর ত কথাই নাই, পাড়া প্রতিবেশীর মেয়েরাও তাঁহার ভয়ে জড় সড় রহে। তিনি সর্ব্বদাই লজ্জার কথা লইয়া নানা দৃষ্টান্তে উপদেশ দেন ও শাসন করেন; এবং অতি ঘনিষ্ট কোন ব্যক্তি যদি সহসা নিকটে আসে, তিনি তৎক্ষণাৎ আজানুলম্বিত ঘোমটা টানিয়া সহর্ষে কম্পিত স্ফুরিত কলেবরে একপার্শ্বে সরিয়া পড়েন। তাঁহার শরীরে ক্রোধ একটুকু বেশী, তিনি যখন সেই অবলাজনসুলভ ক্ষণস্থায়ী ক্রোধের ক্ষণেক উত্তেজনায় বাড়ীর ভিতর হুঙ্কার দেন, বহির্বাটীর প্রাচীর চত্বরও তখন থর থর কাঁপিয়া উঠে এবং গ্রাম্য পাঠশালার অনেক গজ কণ্ঠ পণ্ডিত এবং দুর্ব্বার বালকবৃন্দও তখন ভয়ে জড় সড় হইয়া চিত্রার্পিতবৎ স্তম্ভিত রহে। কেহ পার্য্যমাণে তাঁহার সহিত বিবাদ বাধাইতে যায় না। তবে যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার সহিত সত্য সত্যই কাহারও বিবাদ বাধিয়া উঠে, তবে তাহারই একদিন আর উহারই একদিন। তিনি তখন একে এক সহস্র এবং মূর্ত্তিমতী মহিষমর্দ্দিনী। তাঁহার আলুলায়িত কেশ কলাপ তখন ঝঞ্ঝা বায়ু বিতাড়িত কাদম্বিনীর কমনীয় কান্তি ধারণ করে, চক্ষে আগ্নেয় গিরির অভিনয় হয়, অঞ্চলের বস্ত্র কটীবন্ধনে পরিণতি পায়, বাহুবল্লরী নাবিকের ক্ষেপণীর ন্যায় পুনঃপুন উৎক্ষিপ্ত ও প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে, চরণ-

দ্বয় শস্য নিষ্পেষণ দণ্ডের শক্তি ও মহিমা কাড়িয়া লয়, এবং ফেনায়মান বদনারবিন্দ তটিনীর ফেনসমাচ্ছন্ন শ্বেত পুলিনকেও বারম্বার ধিক্কার দেয়। এ সকল কিছুতেই তাঁহার লজ্জার ব্যাঘাত হয় না; অথচ অপরকে লজ্জাহীনা বলিয়া তিরস্কার করিতে তাঁহার অধিকারের তামাদি হয় না।

আমরা বলি, প্রকৃত লজ্জা আর এক সামগ্রী। উহা বস্তুতঃই অবলার অমূল্য আভরণ, এবং আভরণ অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান এক প্রীতিপ্রদ মনোহর আবরণ। উহা অবলার মুখচ্ছবিকে ছায়ার ন্যায় ঢাকিয়া রাখে, দৃষ্টির তীব্রতা ও চাঞ্চল্য বিনাশ করে, অথচ দৃষ্টিতে প্রেমীজনস্পৃহনীয় কি এক অপূর্ব্ব মাধুরী আনিয়া মাখিয়া দেয়। কথার কঠোরতাকে কোমলতায় দ্রবীভূত করায়, এবং ক্রমশ বিকশিত, ক্রমশ পরিপুষ্ট হইয়া পবিত্রতারই আর এক মূর্ত্তির মত অঙ্গে একেবারে মিশিয়া যায়। সেই লজ্জা কি এই? যদি লজ্জার জন্যই ঘোমটার আবরণ তাহা হইলে যে সকল অঙ্গ আভরণের ছটায় প্রদর্শন করিতে পণ্যবিলাসিনীরও লজ্জিত হওয়া উচিত, সে সকল অঙ্গে চন্দ্রহার কেন? যে মৃদু মধুর মোহন হাস্য অবলার বিম্বাধরে কুসুমের অস্ফুট বিকাশের ন্যায় সুন্দর দেখায়, সেই হাস্যের এই ভীষণ হিল্লোল কেন? এবং বিরোধের ঘনঘটা ও ভৈরব তর্জ্জন গর্জ্জন কেন?

ঘোমটা অবলার লজ্জা রক্ষার সহায় হওয়া দূরে থাকুক, আমার বিবেচনায় লজ্জার অমন ছদ্মবেশী নিমন্ত্রিত শত্রু আর অল্প আছে। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আজও ইহা আর্য্য সমাজ বলিয়া পরিচিত, নির্ম্মল হিন্দুসমাজের একার্দ্ধকে কুলকলঙ্কের মত ঢাকিয়া রাখিতে অধিকার পাইতেছে। আমরা অনেক সময়ে গির্জ্জা প্রভৃতি ধর্ম্মমন্দিরে অনেক শুদ্ধচারিণী কুলকামিনীরও জালাচ্ছন্ন চক্ষে কেমন এক প্রকার চটুলতা, হৃদয়ে কেমন এক তরল তরঙ্গ এবং মনে

কেমন এক কৌতূহলের আকুলতা দেখিয়া অধোবদন হইয়া রহি। পক্ষান্তরে অনেক সাধুবৃত্ত যুবজনদিগের মধ্যেও পুর-সুন্দরীদিগের জালাচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন রূপরাশি দেখিবার মতি ও প্রবৃত্তির পরিচয় পাইয়া ব্যথিত হই। প্রকৃত প্রস্তাবে ঘোমটার কৃত্রিম আবরণই এ সকল কৃত্রিমলীলা চাতুরীর প্রধান কারণ। চক্ষুর স্বাভাবিক লালসা লোক নিগ্রহে নিরুদ্ধ হয় এবং নিরুদ্ধা হইয়া অস্বাভাবিক বর্ত্মে বিচরণ করে। হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবাহ গতি পথে বাধা পায়; এবং বাধা পাইয়া অস্বাভাবিক গর্হিত পথে গড়াইয়া পড়ে। মনের অনিবার্য্য তৃষ্ণা স্বাভাবিক আনন্দলাভে বঞ্চিত হয়। এবং বঞ্চিত হইয়া অস্বাভাবিক আনন্দে তৃপ্তির অন্বেষণ করিতে থাকে। একটুকু চিন্তা করিলেই প্রতীত হইবে যে, ঐ ঘোমটাই তাহার মূল। অবলার সুমার্জ্জিত রুচি এবং পুরুষের সুশিক্ষিত চক্ষু সামাজিক পবিত্রতার অদ্বিতীয় সুহৃদ। যাহারা কিছুতেই লজ্জা পায় না, কিছুতেই আচারগত উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে নিবৃত্ত হয় না এবং কিছুতেই আপনাদিগের অসভ্যতা ও অবজ্ঞাজনক ইতরতা অনুভব করিয়া সঙ্কুচিত হইতে শিখে না, অবলার অমৃতাভিষিক্ত গরলময়ী দৃষ্টি তাহাদিগকেও তীব্র কষাঘাতের ন্যায় শাসন করে। ঘোমটা সমাজকে সেই প্রার্থনীয় শাসনে বঞ্চিত রাখিয়াছে। বস্তুতঃ ঘোমটা এক অপ্রাকৃত দৃশ্য, প্রকারান্তরে পুরুষের নির্লজ্জতা ও নিষ্ঠুরতার একমাত্র আশ্চর্য্য নিদর্শন। ইতি

নারীজন্ম।

"কেন আসিলাম হায় এ পাপ সংসারে ?
কেন লভিলাম জন্ম বাঙ্গালীর ঘরে।"

নারীজন্ম বড় পাপ—বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, সর্ব্বাপেক্ষা বঙ্গদেশে। কেবল জন্মদোষেই আমরা ছোট, পুরুষ বড়। হাজার বুদ্ধিমতী হই, হাজার গুণবতী হই, তবু পুরুষদিগের বিচারে বার হাত কাপড়ে কাছা নাই। কাছা নাই, সত্য ; কিন্তু কাছা থাকিয়াই যে, তাঁহারা কি ইন্দ্রত্বলাভ করিতে পারিয়াছেন, তাওত দেখি না। তবে তাঁহারা বাঙ্গালি পুরুষ, কাছা আঁটায় একটা সুবিধা আছে—পলায়নের বেলায় বেশ সহজে কার্য্য সিদ্ধ হয়। পথে কুকুর ডাকিলে, অথবা ছাদের উপর হনুমান আসিলে, যখন পুরুষেরা সাহসে বুক বাঁধিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আমাদের আঁচল ধরিতে আসেন, তখন পায়ে কাপড় জড়াইয়া যায় না, এটা আপনাদের পক্ষে বড় বিশেষ সুবিধা, সন্দেহ নাই।

নারী জন্ম বড় পাপ! পূর্ব্বজন্মাচরিত পাপের ফলে যদি একটী কন্যা সন্তান হইল, অমনি যেন বাড়ীশুদ্ধ লোকের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। পিতা বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া উঠিলেন, বাত্যাবিচ্ছিন্ন বল্লরীর ন্যায় হস্তমধ্যে মুখ লুকাইয়া শুইয়া পড়িলেন—হয়ত সেই সন্তাপে জ্বর হইল। মাতা কন্যা প্রসব করিয়াছেন বলিয়া আপনাকে বড় হতভাগিনী মনে করিলেন—পতিপ্রেম হারাইবার আশঙ্কায় নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। শত্রু হাসিল বলিয়া আত্মীয়স্বজন বিষণ্ন হইলেন—মুখময় কে যেন কালী ঢালিয়া দিল। যে না জানে, সে মনে করে, বাড়ীতে বুঝি ডাকাইতি হইয়াছে, বুঝি কে মরিয়াছে। যে জানে, সে মনে করে, ডাকাইতি হইলে যে ছিল ভাল, কেহ মরিলেও যে ছিল ভাল।

পুত্র কন্যার মধ্যে পিতা মাতায় যে তারতম্য করেন——স্নেহের যে তারতম্য থাকে, তাহা ঠিক বলিতে পারি না; তবে ব্যবহারের তারতম্য যে থাকে, তাহা বলা বাহুল্য—কিন্তু তাহার জন্য তাঁহাদিগকে দোষ দি না। পুত্র বড় হইয়া রোজকার করিয়া দিবে, কন্যাত তাহা দিবেনা! তবে পুত্র-নির্ব্বিশেষ ব্যবহারই বা সে কেন পাইবে? যাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিয়া পরকে বিলাইয়া দিতে হইবে, তাহাকে খাওয়ান পরান ন ধর্ম্মায় ন দেবায়—ইহার অপেক্ষা জলে ফেলিয়া দেওয়া ভাল। এরূপ ভাব পিতার মুখে প্রকাশ না হউক, ব্যবহারে প্রকাশ পায়। পুত্রের অন্নপ্রাশনে দেশদেশান্তরে খবর যাইবে—সাজাইবার জন্য গলকন্দা হইতে হীরক আসিবে, ঢাকা হইতে অলঙ্কার আসিবে; বিলাইবার জন্যকাশ্মীর হইতে শাল আসিবে, বারানসি হইতে সাড়ী আসিবে; আমোদের জন্য কলিকাতা হইতে খেমটা আসিবে, লক্ষ্ণৌ হইতে বাই আসিবে; আমোদ করিবার জন্য দেশদেশান্তর হইতে আত্মীয় কুটুম্ব আসিবে; আহারের জন্য উইলসনের বাড়ীর খানা আসিবে——আহার করিতে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত ন্যায়লঙ্কার ফুলের মুখুটি বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান আসিবেন। দক্ষিণার টাকায় পুরোহিতের ব্রাহ্মণীর সোণার কঙ্কন হইবে। নাপিত গরদের জোড় পাইবে, নাপিতানী বহুদিনের সাধ পূরাইয়া বালুচরের সাড়ীর উপর চন্দ্রহার দোলাইবে। পিতার সময়ে স্নান হইবে না, সময়ে আহার হইবে না। মাতা কার্য্যের ব্যস্ততায় ন্যূনকল্পে দিনান্তে দশবার সালগ্রাম শীলার মস্তকে পা দিবেন। আর বাড়ীর চাকর, নফর, রাঁধুনী, চাকরাণী, বৌ, ঝি, মন্দিরস্থ বিগ্রহের পর্য্যন্ত গলা ভাঙ্গিয়া যাইবে। পাড়ার কত লোকের যে জ্বরাতিসার হইবে, তার আর সীমা থাকিবে না। আর মেয়ের বেলায়?—সাজাইবার জন্য বড় পিসির হাতের ভাঙ্গা বালা, আর ছোট ঠাকরুণ দিদির পায়ের ফুটো মল; পরাইবার জন্য বড় বৌয়ের নব-

বধূ-অবস্থার পুতুলের কাপড়, অথবা অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের ছেলে-বেলাকার চেলী——বদল করিয়া বাটি কিনিবার জন্য ছিল, না হয় মেয়েটা পরিল। নাপিতানীর লাভ, বড় জোর এক থালা মাড়ে-ভাতে। নাপিত বেচারার আসা যাওয়াই সার। পুরোহিতের দক্ষিণা—মধুপর্কের বাটিটি, আর নগদ পাঁচ পয়সা।

পুত্রের আদরই বা কত ? প্রায় কোলে কোলেই বেড়ায়, কোলে কোলেই থাকে, কেননা এ অমূল্য নিধি মাটিতে রাখিলে পীপিড়ায় খায়, মাথায় রাখিলে উকুনে খায়। আর মেয়েটা প্রায় পাড়ার গোয়ালা বাড়ী পড়িয়া থাকে—ধূলা মাখে, কাদা খায়, পেটে চুল-কানি, পায়ে ঘা, মাথায় উকুন, চুলে জটা, নাকে পোঁটা, মুখে অশ্রু-রেখা, বুকে মুখনিঃসৃত লালার বসুধারা, গায়ে উদগীরিত দুগ্ধের দুর্গন্ধ—কেহ দেখে না, কেহ সুধায় না ; মেয়ে আপনি কাঁদে, আপনি চুপ করে, আপন মনে খেলা করে, আপন মনে হাসে। দিনান্তে যদি একবার মায়ের কোলে উঠিতে পায়, তবে সে পরম ভাগ্যবতী। আর পিতার সঙ্গে—সেই অন্নপ্রাশনের দিনে দেখা হইয়াছিল,আর সেই বিবাহের রাত্রে দেখা হইবে! পুত্র রাত্রি দুই প্রহ-রের সময় উঠিয়া ধূয়া ধরিল "আমি রৌদ্রে পৃষ্ঠ দিয়া সন্দেশ খাইব"—অমনি সেই দুই প্রহর রাত্রে—মুষল ধারে বৃষ্টি হইতেছে, পলে পলে বিদ্যুৎ ঝলসিতেছে, পলে পলে বজ্রনির্ঘোষ হইতেছে—সেই দুর্দিনের নিশীথ অন্ধকারে রৌদ্রের অন্বেষণে পাড়ায় পাড়ায় লোক ছুটিবে ;—মেয়েটা সাত দিন সাত রাত মাথা কুটিয়াও এক পয়সার একটা খেলানা পায় না। পুত্র যদি একবার কাঁদিল, অমনি বাড়ী শুদ্ধ হুলস্থূল পড়িয়া গেল—কাঁদিয়া পাছে ছেলের মাথা ধরে,এই আশঙ্কায় প্রসূতির মাথা ধরিল,জনকের সন্নিপাৎ চাপিল,রাধুনী মাগী ত্রিপুষ্করাগ্রস্ত হইল, চাকরাণীরা মাথা ভাঙ্গিতে বসিল—আর মেয়েটার যদি কাঁদিয়া দম আট্‌কায়, তবু কেহ একবার সুধায় না,কেহ একবার আহা করে না।

পুত্র কন্যার মধ্যে এইরূপ তারতম্য করাটা যে নিতান্ত নিষ্কারণ নহে, তাহা বিবাহের সময় বেশ বুঝা যায়। পুত্রের পিতা আশা বাঁধিয়া রাখেন, যে ইহার বিবাহোপলক্ষে এক খানা জমীদারি বা কোম্পানীর কাগজ করিয়া লইব। তার পর যদি একটু কুলের গন্ধ থাকিল, যদি ছেলেটা মুখস্থ করিয়া হউক, প্রশ্ন চুরি করিয়া হউক, উত্তর নকল করিয়া হউক, অদৃষ্টগুণে হউক, যদি কোন প্রকারে কায়-ক্লেশে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, তবে সেই ছেলের বাপই বা কে আর দীল্লির সম্রাটইবা কে? ছেলে যখন একটা পাশ করিয়াছে, তখন সে অবধারিত হাইকোর্টের জজ হইবে। তখন পাড়ার রসতরঙ্গিনীগণ অপরাহ্ণে পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে দাঁড়াইয়া, জলে কলসি ভাসাইয়া দিয়া, তৎসম্বন্ধে কত রসের গল্প করিবে। কেহ বলিবে, ছেলের এই অল্প বয়সে এত বিদ্যা হইয়াছে, যে কালেজের সাহেবেরা আর পড়াইয়া উঠিতে পারে না—বড় সাহেব স্বয়ং হার মানিয়াছেন, অন্যে পরে কা-কথা। কেহ বলিবে, কোম্পানি বাহাদুর নিজ হাতে লাল কালি দিয়া দাদাঠাকুরকে চিঠি লিখিয়াছেন যে, "তোমার ছেলের যে বিদ্যা হইয়াছে, ইহার অধিক হইলে আর আমি উপযুক্ত চাকরি যোগাইতে পারিব না, অতএব এই বেলায় চাকরি করিতে দাও—দারগার মুহুরিগিরি খালি আছে"। ক্রমে বাঁধা বকুলতলার তাসের আড্ডায় কত অশীতিপর বৃদ্ধ চক্‌মকি ঠুকিতে ঠুকিতে এই কথার সমালোচন করিল। কত জন আশঙ্কা করিয়া বলিল—তাইত হে! এই বয়সে এত! বাঁচে কি না, সন্দেহ। কত জন দীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া বলিল, "গুরু, তোমার ইচ্ছা! আমার চতুর্থ পক্ষের ছোট কন্যাটি থাকিলে এত দিন বিবাহযোগ্যা হইত। ক্রমে দেশময় রাষ্ট হইল, যে অমুকের পুত্রের চতুর্ভুজ হইতে আর বড় বাকী নাই।

তখন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল।

পাত্র কর্ত্তার মেজাজ বেজায় গরম—তিনি সময় বুঝিয়া স্বর্গে এক ঠোঁট মর্ত্ত্যে এক ঠোঁট দিয়া সর্ব্বগ্রাস করিতে প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছেন। যদি কোন কন্যাদায়ের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল, অমনি তাঁহাকে হাতে বহরে লম্বা দীর্ঘ এক তালিকা দেওয়া হইল, তাহাতে নাই হেন জিনিস নাই—ঘড়ি চাই, চেইন-চাই, বিবিয়ানা পোষাক চাই, আকাশের চাঁদ চাই, আলাদিনের প্রদীপ চাই,—সংক্ষেপতঃ অর্দ্ধেক রাজত্ব এবং এক রাজকন্যা চাই। তা ইহাতেই কি নিস্তার আছে? এ শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়ায়। পাত্র কর্ত্তা যাইবেন আপন পুত্রের বিবাহ দিতে,সপ্তসিন্ধুর জল আনিয়া তাঁহার পদধৌত করিতে হইবে। গ্রামের অসভ্যের দল—ভদ্রতার চিরশত্রু, সরস্বতীর ত্যজ্য পুত্র—বরযাত্র যাইবেন; তাঁহাদিগকে সোনার সিংহাসনে বসাইয়া মাণিকের ছাতা ধরিতে হইবে। তাঁহারা হুঁকা চুরি করিবেন,জুতা চুরি করিবেন, শুভ্রশির বৃদ্ধকে ব্যঙ্গ করিবেন, গৃহস্থের বৌঝিকে রহস্য করিবেন,—সব নতশিরে সহ্য করিয়া কীর্ত্তিকুশলদিগকে গুরুপুত্রের অধিক সমাদর করিতে হইবে। সাত পুরুষে যার মর্য্যাদার সঙ্গে সম্পর্ক নাই, তাহাকেও দেবতার ন্যায় মর্য্যাদা করিতে হইবে। এত করিয়াও পার নাই। এততেও পাত্রকর্ত্তার দাবি মিটে না। অকস্মাৎ প্রকাশ হইল মেয়ের উল্কি নাই—অতএব এক শ টাকা বাটা দাও। বুঝা গেল, মেয়ের ভগিনীর গোঁফ্ নাই—অতএব দুই শ টাকা সুখদণ্ড দাও। দেখা গেল, মেয়ের ভ্রাতার লেজ নাই, তজ্জন্য এক খানা নিষ্কর জমী আক্কেলসেলামি দাও। সর্ব্বশেষে, কন্যা সন্তান জন্মাইয়াছ, এবং সেই কন্যার এমন শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছ, এই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তের জন্য জন্মাবচ্ছিন্নে দাসখৎ লিখিয়া দাও—যত দিন বাঁচিবে, যাহা বলিব কৃতার্থ হইয়া করিও; যাহা চাহিব, হাসি মুখে দিও।

কন্যা সন্তানের অনাদর করিতে বাঙ্গালিরা অন্যের কাছে শিখে নাই। এ প্রবৃত্তি এই মাটীরই ফসল। যে বাঙ্গালীরা পিতৃশ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত

ইংরাজের অনুকরণে সমাধা করেন, আমাদের দুরদৃষ্টক্রমে কন্যাকে কিরূপ স্নেহ নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে হয় সেটুকু শিখেন নাই। তাঁহারা মনে করেন, কন্যাকে নিরূপিত বয়সে—প্রায়ই তৎপূর্ব্বে, তৎপশ্চাতে কখনই নহে—পরান্নভোগিনী, পরাবসথশায়িনী হইতে হইবে। সুতরাং পিতৃগৃহে কন্যার অনাদরই ভাল। তাঁহারা ভাবেন যদি বিবাহ তাহার অদৃষ্টে সুখের হয়, তবে পূর্ব্ব অনাদর নিবন্ধন সুখ বৃদ্ধি হইবে—দুঃখের পর সুখ, যেন হিমান্তে বসন্ত, যেন বর্ষান্তে শরৎ, যেন মেঘান্তে জ্যোৎস্না, যেন বিচ্ছেদান্তে মিলন—বড় মধুর। যদি অদৃষ্ট তেমন না হয়, তাহাতেও বিশেষ দুঃখ হইবে না। অনাদরে যে অভ্যস্ত, অনাদর তাহার কাছে বিশেষ ক্লেশকর বলিয়া বোধ হইবে না—কিন্তু যদি কপাল পোড়া হয়, যদি বিধাতা বিমুখ হয়, তবে মর্ম্মান্তিক হইবে—সুখের পর দুঃখ হইলে প্রাণ রাখিতে ইচ্ছা করে না। বিবাহের রাত্রে বিদ্যুল্লতাকে দেখিয়াছিলাম, যেন গোলাব ফুল ফুটিয়া আছে—সূর্য্যালোকের ন্যায় প্রফুল্ল, বায়ুর ন্যায় ক্রীড়াশীল, নিদ্রার ন্যায় মনোহর, স্বপ্নের ন্যায় সুন্দর। কেমন সুকুমার—যেন নিদাঘ সন্ধ্যার আকাশ, যেন দূরাগত সংগীতের শেষ ভাগ, যেন বিস্মৃত স্বপ্নের অস্পষ্ট স্মৃতি। সেই কুসুমকোমল, কুসুমসুকুমার বিদ্যুল্লতা সেদিন শ্বশুরালয় হইতে আসিয়াছে, যেন হাড়ের মালা—দেখিয়া চিনিতে পারি না, পরিচয় লইয়া চিনিলাম। বিদ্যুল্লতা তাহার পিতার এক মাত্র কন্যা—বড় সোহাগের পাত্র—মনের সাধ মুখে প্রকাশ না হইতে পূর্ণ হইয়াছে; শাসন কেমন কখন জানে নাই, কর্ক্কশ কথা কেমন কখন শুনে নাই। গায়ে ছড় যাইবে বলিয়া বিদ্যুল্লতা কখনও নূতন কাপড় পরে নাই, গলায় বাধিবে বলিয়া দুগ্ধসর না ছাঁকিয়া খায় নাই। সেই বিদ্যুল্লতা আজ এমন—মলিনা, কাতরা, দুঃখভারপীড়িতা—যেন সাক্ষাৎ বিষাদ। স্কন্ধের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু কোটরে বসিয়া

গিয়াছে, শরীরের সকল অঙ্গই দীর্ঘাকৃত হইয়াছে, দৃষ্টি শূন্যন্যস্ত— সদাই অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবে--সদাই যেন পতনোন্মুখ নিশ্বাস চাপিয়া রাখিতে ব্যস্ত। মুখে হাসি ধরিত না—আগে হাসিয়া তবে কথা কহিত--এখন সেই মুখ দেখিয়া বোধ হয় যেন ইহাতে ইহজন্মে কখনও হাসি খেলে নাই। তাহার পতনোন্মুখ নিশ্বাস, বর্ষণোন্মুখ চক্ষু, অশ্রুপূর্ণ স্বর, নৈরাশ্যমন্থর গতি—হায়! এই জীবন্ত কুসুম-রূপিণী বালিকার কপালে এত ছিল? আমার কান্না পায়—কবে শুনিতে হইবে, বিদ্যুল্লতা নাই। পিতৃগৃহে এত সোহাগ না হইলে বুঝি এ কোজাগরের চাঁদ মেঘে ডুবিত না, বুঝি এ বসন্তব্রততী অকালে শুকাইত না, বুঝি বিদ্যুল্লতাকে এমন করিয়া মরিতে হইত না। স্বামীরগৃহে বিদ্যুৎ যে দুঃখ ভুগিয়াছে—সে অনেক কথা, সে মর্ম্মপীড়ার কথা এখন বলিব।

স্বামী গৃহের সুখ, হায রে কপাল! সে রসের কথা বলি কাকে? শুনে কে? স্বামী ভাবিয়া রাখেন, এ যেন ইন্দ্রিয়বিশিষ্টা, চেষ্টাযুক্তা পাষাণ প্রতিমা। মনে করেন, ইহার প্রাণ প্রাণ নহে, প্রেমবিশিষ্ট চৈতন্য মাত্র। তিনি রাত তিনটা পর্য্যন্ত লোকের দুয়ারে দুয়ারে মাথা কুটিয়া, শেষ নিশায় প্রভাত বায়ু সেবন করিতে, প্রভাত নিদ্রা উপভোগ করিতে, দাসীকে চরিতার্থ করিতে ঘরে আসিবেন, আর আমাদিগকে বাতাস করিতে হইবে, পদসেবা করিতে হইবে, হাসি মুখে কথা কহিতে হইবে, তাঁহার রসিকতায় হাসিতে হইবে, তাঁহার প্রেমালাপে গলিয়া জলের অধিক হইতে হইবে, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া আহ্লাদে আঠারখানা হইতে হইবে! রাগ করা নিষেধ, অভিমান নিষেধ, মুখ ভারি করা নিষেধ—সেই সুখের প্রভাত মিলনে ন-ধর হইতে হইবে। মনে করিতে হইবে যে, "প্রভাতে হেরিনু এ চাঁদ বদন দিন যাবে ভালে ভাল"। ইহাই যদি না পারিলাম—শরীরই ত, যদি না চলিল—

নিত্য আশাপথ চাহিয়া, রাত জাগিয়া বসিয়া থাকিতে না পারিলাম; মনই ত, যদি না বুঝিল—নিত্য হাসিমুখে যদি অভ্যর্থনা করিতে না পারিলাম, তবেই আগুন লাগিল। অপরাধের মধ্যে, শেষ রাত্রে তিনি খোলশ-ছাড়া সাপের মতন ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে গড়িতে গড়িতে ঘরে আসিয়াছিলেন, আমি হাসিয়া কথা কই নাই—অপরাধ ত এই, ইহারই জন্য এত। তা ইহাতেই কি নিস্তার আছে? পর দিন পাড়ার গেজেট সুভদ্রার পিসী পাড়ায় পাড়ায় খবর দিয়া আসিল—চাটুয্যেদের ছোট বৌ স্বামীকে নাথি মারিয়া খাট হইতে ফেলিয়া দিয়াছিল, আমি গিয়া চোখে মুখে জল দিয়া দাঁতি ছাড়াই। শেষে কি করি, কাটা কাণ চুল দিয়া ঢাকিয়া, পায়ে ধরিয়া মান ভাঙ্গাইতে হয়।

কি করি, সকলই সহ্য করিতে হয়। না করিলে উপায় নাই। কারণে হউক, অকারণে হউক, স্বামী যদি বিমুখ হইল, তবে এত বড় পৃথিবীটাতে আর আমাদের দাঁড়াইবার স্থান থাকিল না। গত্যন্তর নাই বলিয়া তোমরা অত্যাচার কর; গত্যন্তর নাই বলিয়া আমাদিগকে সবই সহ্য করিতে হয়। এত যে অত্যাচার কর—কতবার রাগ কর, কতবার মুখ বাঁকাও, কতবার অন্যায় তিরস্কার কর, কতবার বাক্যালাপ রহিত কর, কতবার পরিত্যাগ করিতে চাও—এত যে অত্যাচার, এত যে লাঞ্ছনা, তবু আশ্রিত, পদানত, শ্রীচরণোপান্তে একটু স্থান পাইবার জন্য লালায়িত। তোমরা পুরুষ, যা কর তাই শোভা পায়; আমরা স্ত্রীলোক হইয়া চোর দায়ে ধরা পড়িয়াছি।

কৃতবিদ্য নব্য বাবুদিগের নিকট আমার একটা নিবেদন আছে। আপনারা পুরুষ, আমরা স্ত্রীলোক—আমরা আপনাদের আশ্রিত, প্রতিপালিত, পদানত—দাসীদিগের একটা নালিশ শুনিবেন না কি? আমরা আপনাদের ক্রীড়ার পুতুল, কথার ভিখারী, দাসীর দাসী—আপনাদের চরণের ধূলো, শ্লিপারের সুখতলা—আপনাদের

জুতার বক্‌লশ্, পিরাণের বোতাম, ফতুয়ার আস্তিন, প্যাণ্টালুনের পকেট, দাসীদিগের প্রতি একবার মুখ তুলিয়া চাহিবেন না কি? আপনারা এত মহৎ কার্য্য করিতেছেন; আমাদের জন্য কিছু করিতে পারেন না কি? আপনারা চস্‌মা চোখে দিয়া স্বদেশের উদ্ধার করিতে পারেন, মদ খাইয়া ভারতের লুপ্ত মনুষ্যত্বের উদ্ধার করিতে পারেন, গরিব দাসীদিগকে কোন প্রকারে এ নরক হইতে উদ্ধার করিতে পারেন না কি? ভাবিয়া দেখুন, আপনারা বৈ আর আমাদের কে আছে? আপনারাই আমাদের সর্ব্বস্ব—আমাদের বিপদে ভরসা, শোকে সান্ত্বনা, ইহলোকের আশ্রয়, পরলোকের গতি—আপনারা আমাদের মাথার মাণিক, নয়নের তারা, অঞ্চলের নিধি, বুকের রক্ত, দেহের নিশ্বাস—আমাদের সীঁতির সিন্দূর, চোখের কাজল; বিবিয়ানার গাউন, পায়ের আলতা—আপনারা আমাদের খোঁপার ফুল, কাণের দুল, চন্দ্রহারের চাঁদ—আমাদের চুলবাঁধা দড়ি, লক্ষ্মীর কড়ি, নূতন কুমড়ার বড়ি, ছড়া ঝাঁটের হাঁড়ি, অন্ধের নড়ি, বারানসী সাড়ী। আপনারাই এ ফুটো ডিঙ্গিতে বাঙ্গাল মাঝি, এ চাকাভাঙ্গা রথের নুলো সারথী, এ ভাঙ্গা ছ্যাকড়ার কাণা কোচম্যান। আপনারা আমাদের জ্বরে একোনাইট, ক্রমিতে সিনা, জীবন-চিম্‌নির কেরোসাইন্—আমাদের ওলাউঠায় ক্যাম্ফার, বাতে ফ্লানেল, বিপদে আক্কেল,—আমাদের দুর্দ্দিনের সম্বল, অরুচির অম্বল, শীতের কম্বল,—একবার দাসীদিগের প্রতি প্রসন্ন হইবেন না কি? মনে করিলে আপনারা কি না করিতে পারেন? আপনারা শাম্‌লা মাথায় দিয়া সরকারি জুজু হইয়া চিরপরিচিতকে ভুলিয়া যাইতে পারেন, তিন দিনের জন্য বিলাতে গিয়া মাতৃভাষা বিস্মৃত হইতে পারেন, ডাল ভাত খাওয়া রোগা-পেটে টুইটুম্বুর করিয়া মদ ঢালিয়া দিয়া ছত্রিশ জাতির উচ্ছিষ্ট গোগ্রাসে গিলিতে পারেন, ভদ্রসন্তান হইয়া থিয়েটরে শং সাজিতে পারেন—আপনারা না পারেন কি? আপনারা

লেখাপড়া না শিখিয়াও পণ্ডিত হইতে পারেন, ম্যাক্‌সমূলরের তালিকা নকল করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ হইতে পারেন, পুরুষ হইয়া স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন—আপনাদের অসাধ্য কি আছে? আপনারা অন্তঃপুরে বক্তৃতা করিতে পারেন, ভিখারিকে গলাধাক্কা দিতে পারেন, গৃহিণীকে পদাঘাত করিতে পারেন, অফিসে গিয়া সোণা হেন মুখ করিয়া সাহেবের লাথি এবং রেলের গাড়ীতে পুলিস সাহেবের অর্দ্ধচন্দ্রও গ্রাস করিতে পারেন,—আপনাদের অসাধ্য কি? আপনারা পার্টিতে বসিয়া রাতকে দিন করেন, খোঁয়ারি চাপিলে দিনকে রাত করেন, তিন পাতা ইংরেজি পড়িয়া বাঙ্গালিকে সাহেব করেন, খ্রীষ্টীয়ান হইয়া ফিরিঙ্গী সাজিয়া পিতা মাতাকে পর করেন—জগতে আপনাদের অসাধ্য কিছু আছে, এ কথা যে বলে, সে মিথ্যাবাদী।

একটী উপদেশ, ছিঃ পুরুষ গুলা বড় নির্ব্বোধ! আপনারা মনে করে আমরা বড় বুঝি, কিন্তু ছাইও বুঝে না। অনেক সময় বুঝাইলেও বুঝে না। উপরন্তু রাগ করিয়া বসিয়া থাকে। স্বাধিষ্ঠিত শাখার মূলচ্ছেদন করিবে, আর ইহাই যদি কেহ বলিবে, অমনি তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিবে। পুরুষেরা হয় ত বলিবেন—"তুমি স্ত্রীলোক, তোমার এত মণ্ডলিতে কায কি বাছা? খাও, পর, ঘুমাও, পরের উপাসনা কর—পুরুষ অবুঝ হোক্ বুঝ হোক্, জাহাজের খবরে তোমার কায কি?"

তা বটে, কিন্তু কায আছে। ইহার ভোগ অনেকটা আমাদিগকে ভুগিতে হয়। আমরা যে সঙ্গদোষে মারা পড়িয়াছি। যে বুঝে, তার সঙ্গে নরকে যাওয়া ভাল; অবুঝের সঙ্গে স্বর্গও কিছু নহে। একটী পণ্ডিত পাদ্রীসাহেবকে বলেছিলেন "তোমার কৃষ্ণ নগরের নেড়ে খ্রীষ্টীয়ান সহ স্বর্গে যাওয়া চেয়ে পণ্ডিত হিন্দুসহ নরকে যাওয়া শ্রেয়ঃ।" হাজার হউক, পণ্ডিতের বুদ্ধি। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইহাদিগকে লইয়া স্বর্গে যাওয়া কেবল পথশ্রম সার—ইহারা আপন গুণে মুহূর্ত্তের মধ্যে স্বর্গকে নরকাধিক করিয়া তুলিবে। আমরা ত একে নরকে

আছি, তায় অবুঝের সঙ্গে—আমাদের কত জ্বালা, ভাবুন দেখি। আমরা যে সকল সঙ্গী পাইয়াছি, তেমন সঙ্গীর সঙ্গে স্বর্গেও সুখ নাই, তাহাতে বঙ্গের শুদ্ধান্ত ত জ্বলন্ত নরক।

তা মরুক ছাই সমাজের কথা? কিন্তু পুরুষদিগকে নির্ব্বোধ কেন বলি শুনিবেন? তাঁহারা মনে করেন, আমরা বড় সুখে আছি। আমাদিগকে বুঝাইতে চাহেন যে, তাঁহারা আমাদিগকে রামরাজ্যে রাখিয়াছেন—পূর্ব্ব জন্মের তপস্যার ফলে তাঁহাদের পদ্ম হস্তে পড়িয়া আমরা সশরীরে স্বর্গভোগ করিতেছি। আর যত জ্বালা তাঁহাদেরই—যত জ্বালা আমাদেরই জন্য। তাঁহারা রৌদ্রে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রোজগার করিয়া আনেন, আমরা পায়ের উপর পা দিয়া কেবল বসিয়া খাই, আর সোণার চন্দ্রহার এবং বারানসী সাড়ীর স্বপ্ন দেখি। তাঁহারা দারুণ সংসার জ্বালায় ক্ষিপ্ত কুকুরের মতন দিন রাত ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করেন, আমরা ঘরে বসিয়া তাঁহাদের বুকের রক্ত শোষণ করি, আর পান খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গা করে, তার উপর মুচকে হেসে, সম্মুখস্থ দর্পণের ভিতর জ্যোৎস্নার উপর বিজলিখেলা দেখিয়া দিন কাটাই। আমাদিগকে ঘরের বাহির হইতে হয় না, চন্দ্র সূর্য্যের মুখ দেখিতে হয় না, গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনা ভাবিতে হয় না—কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই—আমাদের সুখের সীমা কি?

বটেইত! আমাদের সুখের সীমা কি? অনুগ্রহ করিয়া পেটে এক মুষ্টি খাইতে দেন, পরনে এক খানা পরিতে দেন, নিশান্তে চরণ দুখানি একবার দেখিতে দেন—আর সুখের চাই কি? আমাদিগকে সোহাগ করিয়া বুকে করেন, পায়ে ধরিয়া মান ভাঙ্গেন, "প্রাণাধিক" "জীবন সর্ব্বস্ব" বলিয়া চিঠি লেখেন—আর সুখের বাকী কি? রাগ হইলে পদাঘাত করেন, বিনাপরাধে মুখ বাঁকান্, কথায় কথায় পরিত্যাগ (Divorce)—আমাদের সুখের অভাব কি?

তা এতই যদি সুখ, তবে আসুন না হয় একবার অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া দেখা যাউক—এক বার দেখিয়া লউন, কিসে কত সুখ দুঃখ। আপনারা রূপার বেড়ি পায়ে দিয়া ঝুম্ ঝুম্ করিয়া অন্দরে প্রবেশ করুন, আমরা আপনাদের বোঝা মাথায় করিয়া সংসারের পথে বাহির হই। আপনারা এক বার কমল হইয়া গৃহসরোবরে ফুটুন, আমরা ভ্রমর হইয়া চরণতলে গুণ গুণ করিতেছি—দয়া করিয়া একটু মধু দিবেন, কিন্তু দেখিবেন যেন অভ্যাস দোষে গুবরে পোকার আমদানি না হয়। আপনারা চাঁদ হইয়া ষোল কলায় গৃহাকাশে উদয় হউন, আমরা চকোর হইয়া উড়িতেছি—আর যেমনই হউক, কিন্তু উপমাটার সার্থকতা কলঙ্কের অভাবে নষ্ট হইবে না। আপনারা পরচুলার খোঁপা বাঁধিয়া, ঘোমটায় দাড়ি ঢাকিয়া, মুখ ফিরাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া মান করিয়া বসুন, আমরা বুট ধরিয়া মান ভাঙ্গিতেছি—কেবল এক ভিক্ষা, আমাদের মানের সঙ্গে যেন আমাদের নাথিটা শুদ্ধ শিখিবেন না; মনে রাখিবেন যে আলতা-পরা পায়ে আর বুট-পরা পায়ে অনেক প্রভেদ। কেমন, রাজি আছেন ত?

তবে আসুন, আপনারা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, পিরীতের আড়ায় বসিয়া সোহাগের ছোলা খাইতে আরম্ভ করুন, আমরা আপনাদিগকে "রাধাকৃষ্ণ" পড়াইবার উদ্যোগ দেখি। আপনারা সলিতা পাকাইতে হাত বশ করুন, আমরা চুরট মুখে প্রদোষ ভ্রমণে বাহির হইতেছি। আপনারা ঘরকন্নার ভার লউন, আমরা সংসারের ভার লইতেছি—আপনারা রন্ধনশালায় প্রবেশ করুন, আমরা কাছারি যাইতেছি। আপনারা রাঁধিবেন, বাড়িবেন, পাখা হাতে করিয়া কাছে বসিয়া আমাদিগকে খাওয়াইবেন, আচমনের পর পান তামাক দিয়া আমাদের পাতে (শ্রীবিষ্ণু) প্রসাদ পাইবেন; আমরা খোঁপার উপর শামলা পরিয়া, চোকের কাজল চস্‌মায় ঢাকিয়া, বড় বড় আইনের পুঁথি হাতে করিয়া কাছারি যাইব। আপনারা ঘরে

বসিয়া লক্ষ্মীর আলপনা দিবেন, চুলের দড়ি বিনাইবেন, ছেলেকে দুধ খাওয়াইবেন, চাকরাণীর সঙ্গে গণ্ডগোল করিবেন; আমরা এজ-লাশে দাঁড়াইয়া, নন্দনকাননে জ্যোৎস্নার মতন রাঙ্গা ঠোঁটের উপর মৃদু হাসির লহর তুলিয়া নথের ফাঁক দিয়া সাক্ষীর জেরা করিব—সাক্ষী মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবে না ত?—জজ সাহেব দম আট-কাইয়া মরিবেন না ত? বেলা পড়িলে আপনারা, শ্যামের কোলে রাইয়ের মতন, মেঘের কোলে বিদ্যুতের মতন, অমাবস্যায় আকাশ প্রদীপের মতন, বার্নিশ করা জুতায় রূপার বক্‌লসের মতন গোঁফের ভিতর দিয়া মুচ্‌কে হেসে, রাজ্যের লোকের নিন্দা এবং নিজের অদ্ভুত গুণরাশির সমালোচন করিতে করিতে কলসিকক্ষে জল আনিতে যাইবেন; আমরা ইয়ার সাথে, ছড়ি হাতে, ঘাটের পথে আপনাদিগকে শুনাইয়া নিধুর টপ্পা গাইব—সে গান শুনিয়া আপ-নারা কক্ষের কলসি মাথায় ভাঙ্গিয়া প্রাণ হারাইয়া ঘরে যাইবেন না ত। আপনাদের সুখের সীমা থাকিবে না। আপনাদের সেই অতুল সুখ পাপচক্ষে একবার দেখিব, এই আমার বড় সাধ। আমরা যখন বিবাহ করিতে যাইব, আর আপনারা চোখে কাজল দিয়া ঠোঁটে মিসি দিয়া, শুষ্ক নিতম্বে চন্দ্রহার ঝুলাইয়া, ফাটা পায়ে আলতা পরিয়া, দল বাঁধিয়া আসিয়া আমাদিগকে ঘেরিয়া বাসর জাগিতে বসিবেন, আর কোটর চক্ষু ঘুরাইয়া রসের চাহনি চাহিবেন, শিও-পালের ন্যায় দন্ত বাহির করিয়া রসের হাসি হাসিবেন; আমরা নয়ন ভরিয়া দেখিব, শত্রুর মুখে ছাই দিয়া কেমন দেখায়—একবার দেখিব, সে কটাক্ষের আগুণে বিশ্বসংসার পোড়ে কি না, সে হাসির তুফানে গরিবদের প্রাণতরী ডুবে কি না। তার পর আমরা যখন সেই বাসর বিলাসে "ফচকে ছোঁড়া ঘাটে পড়া" বলিয়া গান ধরিব, তখন আপনারা ভাবে ভোর হইয়া সুখাতিশয্যে সেই বাসরের কোণে গোটে গোটে মরিয়া পড়িয়া থাকিবেন—সুখের সীমা থাকিবে না।

আমরা আপনাদের সকল মহৎ কার্য্যেরই ভার লইব। তবে একেবারে ঠিক বাবু হইয়া উঠিতে পারিব কি না, সেই এক কথা। আমরা লেখা পড়া শিখিয়া যণ্ডামার্ক হইতে, গলা বাজি করিয়া ইংরাজ তাড়াইতে, ইংরেজি পড়িয়া গুরুজনের অবহেলা করিতে, ব্রাহ্ম হইয়া ছত্রিশ জাতকে তরাইতে পারিব কি না, সেই এক ভাবনা। কবিরাজ হইয়া লালবড়ির পরিবর্ত্তে আকার পোড়া মাটি চালাইতে, ডাক্তার হইয়া ল্যাটিন নামের দৌলতে সোণার দামে জল বিক্রয় করিতে, ইস্কুল মাষ্টার হইয়া পড়াই না পড়াই ছুচোখো ছেলে ঠেঙ্গাইতে, হাকিম হইয়া গরিবের সর্ব্বনাশ করিতে, খ্রীষ্টিয়ান হইয়া মিসের নাগরকানাই হইতে, আবার চাপ পেলে আধ্যাত্মিক পুত্র হইতে পারিব কি না, সেই সন্দেহ।

তা, পারি না পারি, আসুন একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। শেষ রাখিতে না পারি, হার মানিয়া ইস্তফা দিব। ইতি॥

সৌন্দর্য্য।

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরৌষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী প্রেক্ষণা নিম্ন নাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রাস্তনাভ্যাং
যা তত্রস্যাদ্‌ যুবতী বিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।

মেঘদূত।

সুন্দরী স্ত্রীলোক ঘরে ঘরে আছে। ব্যক্তি বিশেষের নিকট ব্যক্তিবিশেষ সুন্দর; পুরুষ স্ত্রীলোকের নিকট সুন্দর, স্ত্রীলোক পুরুষের নিকট সুন্দরী। স্ত্রীলোক না থাকিলে পুরুষ এত সুন্দর হইত না; আবার পুরুষ না থাকিলে স্ত্রীলোক এত সুন্দরী হইত না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য সৌন্দর্য্য কি? বস্তুর গুণ, না মনের বিকার? অনেকে বলেন সৌন্দর্য্য বস্তুর গুণ; কিন্তু আমরা বলি উহা মনের বিকার মাত্র। সৌন্দর্য্য বস্তুর গুণ হইলে, তবে যে বস্তু নিরীক্ষণ করিয়া পূর্ব্বে আহ্লাদিত হইতাম, এক্ষণে তাহা দেখিয়া প্রীত হইনা কেন? ইতঃপূর্ব্বে দাঁতে মিশি, উল্কী পরা, শঙ্খধারিণীকে সুন্দরী বোধ হইত, এক্ষণে রাক্ষসীর ন্যায় কুৎসিতা দেখায়; সুতরাং সুন্দর না লাগিয়া কুৎসিৎ লাগে।

পক্ষান্তরে সৌন্দর্য্য বস্তুর গুণ হইলে, ব্যক্তিভেদে সৌন্দর্য্যের তারতম্য হইত না। ইন্দ্রিয়ের সমধর্ম্মতা থাকিলে জ্ঞানেরও সমধর্ম্মতা থাকিবে। দুইজনের চক্ষুই এক উপাদানে নির্ম্মিত; তথাপি এক জন এক বস্তু দেখিয়া প্রীত হয়, অপরে প্রীতি লাভ করিতে পারে না। তাই বলি সৌন্দর্য্য বস্তুর গুণ নয়; উহা মনের বিকার মাত্র। মনের গতি অনুসারে সৌন্দর্য্যের তারতম্য। আমি যে কৃষ্ণ কেশী স্ত্রীলোক দেখিলে সুন্দরী বলিয়া ব্যাখ্যা করি,—ইংরেজেরা তাহাকে কুৎসিতা বলিবেন; কেননা তাঁহারা পট্ট কেশীকে সুন্দরী বলিয়া ভালবাসেন। চীনেরা ক্ষুদ্র চক্ষুকে সৌন্দর্য্যের লক্ষণ বিবেচনা করেন; আমাদিগের নিকট ক্ষুদ্র চক্ষু কদর্য্যতার পরিচায়ক। আরো দেখিতে পাই, আমি যাহাকে কুৎসিৎ বলি, অপর এক জন তাহাকে পরম সুন্দর বলিয়া প্রাণ তুল্য স্নেহ করে। তাই বলি স্নেহের কারণ মনে; অবয়বে নহে। অনুষঙ্গেও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। অলঙ্কার অনেক দেখা যায়, কিন্তু মৃতা স্ত্রীর পিত্তলের বালা গাছিটী যেমন সুন্দর, হ্যামিলটনের দোকান খুঁজিয়াও তেমন একগাছি বালা পাওয়া যায় না। এই সৌন্দর্য্যের কারণ, মৃতা স্ত্রীর স্মৃতি ও তজ্জনিত আহ্লাদ। তাই বলি, সৌন্দর্য্য বস্তুতে নাই—সৌন্দর্য্য মনে। চিত্তই সৌন্দর্য্যের উৎস।

এক্ষণে আর একটা মীমাংসা করা যাউক। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে

অধিক সুন্দর কে?—পুরুষ না স্ত্রীলোক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উভয়ের নিকট উভয়ে সুন্দর। কিন্তু উদাসীন ভাবে বলিতে গেলে স্ত্রীলোকই সুন্দরী। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যের পরিমাণ পুরুষ অপেক্ষা অনেক বেশী। কোমলতা সৌন্দর্য্যের প্রধান অঙ্গ; দেখ স্ত্রীলোকের শরীর পুরুষ হইতে কোমল। শরীর কোমল না হইলে শরীরের লাবণ্য হয় না—স্ত্রীলোক লাবণ্যময়ী—স্ত্রীলোকের কণ্ঠ ধ্বনি মধুর, মধুরতায় প্রাণ উদাস করে; ঔদাস্যই সৌন্দর্য্য—স্ত্রীলোক সুন্দরী। মন্থরগতি সৌন্দর্য্যের কারণ; স্ত্রীলোক মরাল গমনা—সুতরাং সুন্দরী! বড় বস্তু দেখিতে ভয়াবহ, পুরুষ স্ত্রীলোক হইতে বড়; সুতরাং ভয়াবহ। ছোট বস্তু দেখিতে সুন্দর; স্ত্রীলোক পুরুষ হইতে ছোট, অতএব স্ত্রীলোক সুন্দরী। স্ত্রী-চিত্ত দয়া মায়া ও বদান্যতায় পূর্ণ; দয়া মায়া ও বদান্যতা চিত্তের সৌন্দর্য্য।—স্ত্রীলোকের চিত্ত সুন্দর। পুরুষ দেখিলে জন্তুগণ দূরে পলায়; কিন্তু স্ত্রীলোক দেখিলে অনেক জন্তু নিকটে আইসে, স্ত্রীলোক সুন্দরী। সাধারণতঃ সিদ্ধান্ত এই স্ত্রীলোভের জন্য যেমন পুরুষের বীরত্ব আবশ্যক, তেমনি পুরুষ লাভের জন্য স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যের আবশ্যক, বোধ হয় ইহা যেন ঈশ্বর দত্ত বিধান, অতএব স্ত্রীলোকই প্রকৃত সুন্দরী।

এখন সুন্দরীদিগের প্রতি একটি কথা—অয়ি পবিত্রময়ি! সুন্দরি! তুমি যে সম্মুখে দর্পণ রক্ষা করত, স্বীয় জলদপটল-নিন্দিত চিকুরদাম বেণী আকারে নিবদ্ধ করিতেছ ও স্বীয় সৌন্দর্য্যের প্রতিবিম্ব সন্দর্শনে তোমার অধোরষ্ঠ যে ঈষৎ হাস্য প্রসব করিতেছে—তুমিই কি যথার্থ সুন্দরী? হে বরাননে! তাম্বুল রাগ-রঞ্জিত অধরোষ্ঠের মনোহারিত্ব দর্পণপটে দেখিতে দেখিতে মনে মনে সৌন্দর্য্য গর্ব্বে গর্ব্বিতা হইতেছ, তুমিই কি যথার্থ সুন্দরী? হে নবীনা! চঞ্চলচিত্তনায়ক "বিদ্যুদ্দাম" নিঃসারিণী নেত্রযুগলের অপাঙ্গদৃষ্টিতে মৃতপ্রায় হইতেছে বলিয়া কি তুমি ভাবি-

তেছ যে, জগতে তুমি অদ্বিতীয়া সুন্দরী? অয়ি লাবণ্যময়ী! বিচেতন ও সংজ্ঞাশূন্য ভাবে প্রেমিক যুবক তোমার বদনের পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য এক মনে নিরীক্ষণ করিতেছে বলিয়া কি তুমি ভাবিতেছ যে, জগতে তোমার মত সুন্দরী আর নাই? যদি এরূপ মনে করিয়া থাক, তবে শীঘ্র সে ভ্রম দূর করিয়া প্রকৃত সৌন্দর্য্য তোমাতে আছে কি না, তাহাই দেখ। কাহাকে সৌন্দর্য্য বলে তাহা এখনও বুঝিতে পার নাই। ঐ রমণীর লোচনের তারাদ্বয় নিবিড় কৃষ্ণ, অতএব উনি সুন্দরী; বাঁড়ুয্যেদের বড়বয়ের নাকটী যেন বাটালী কাটা, সুতরাং তিনি সুন্দরী; ওপাড়ার হালদারদের মেজ মেয়ের রঙ্গটী যেন কাঁচা হলুদ বা দুধে আলতা, অতএব তাঁহার সৌন্দর্য্যের প্রতি সন্দেহ করা অবিধি—ইত্যাদি প্রকার সৌন্দর্য্যের বিচার ও তাহার বাদানুবাদ সততই জন সমাজে শ্রবণ করা যায়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রঙ্, নাক, চোক্ প্রভৃতি লইয়া কি সৌন্দর্য্য হয়? নাক, চোক্, মুখ ভাল হইলেই কি তাহার সৌন্দর্য্যের প্রতি আর সন্দেহ করিবার উপায় নাই? আসল কথা, যে যাহাকে ভালবাসে তাহার দেহে সমস্ত সৌন্দর্য্যের সমষ্টি ও তাহার অন্তরে সমস্ত গুণের ভাণ্ডার দেখিতে পায়। তাই পুরুষ স্ত্রীকে এবং স্ত্রী পুরুষকে সুন্দর দেখে। এই জন্যই যুবক বা বৃদ্ধ, স্ত্রীর অপ্রশংসা শুনিলে মুখ ভার করেন; এই জন্যই নবীনা স্বীয় পিতৃসমবয়স্ক স্বামীকেও সাধ করিয়া সিমলার কালাপেড়ে ধুতি পরাইয়া সুখী হন। তোমাকে আমি অযথা ভালবাসি বলিয়া তোমার দেহে অযথা রূপের, অন্তরে অযথা গুণের সমাবেশ দেখিতে পাই সত্য, কিন্তু জগৎ তো আমার চক্ষে দেখে না। জগতের চক্ষে এই অযথা সৌন্দর্য্যের অবশ্যই অন্যরূপ বিচার হইবে। সুতরাং আমি তোমাকে পরম সুন্দর বলিলে অন্যে হয়ত তাহার বিপরীত বলিবে। তোমাকে আমি ভালবাসি বলিয়াই তোমার শরীরে আমি এত সৌন্দর্য্য দেখিতে

পাই, কিন্তু তোমাকে আমি যত ভালবাসি এত আর জগতে কেহই বাসে না, এই জন্যই হে নবীনা রূপসীগণ ও নবীন ভাবুক-কুল, তোমরা আপনি আপন মোহিত হও। কিন্তু জানিও, জগৎ হয়ত তোমাকে সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে তাদৃশ প্রশংসা দিতে প্রস্তুত নহে। তোমাকে আমি ভালবাসি বলিয়া তোমার দেহের সৌন্দর্য্য দর্শন করি, অন্যে তাদৃশ ভালবাসে না বলিয়া তাদৃশ সৌন্দর্য্যের সত্তা অনুভব করে না। এই জন্যই জগন্মধ্যে সৌন্দর্য্যের রুচি সম্বন্ধে ভয়ানক অনৈক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। "দেশভেদে, জাতি ভেদে, মনুষ্য ভেদে, সৌন্দর্য্যের রুচি ভিন্নবিধ। জগতীস্থ বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জাতি সমূহে বিভিন্ন প্রকার সৌন্দর্য্য প্রচলিত। কোন জাতি হয়ত তুষার ধবলাঙ্গী, তাম্রকেশী, বিড়ালাক্ষীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হন। কোন জাতি হয়ত ক্ষুদ্র পদ-শালিনী, নখর-কুলিশ প্রহারিণী, সর্ষপ-সম-লোচনী যোষার গৌরব করেন। অপর কোন জাতি হয়ত কৃষ্ণাঙ্গী, স্থূলচর্ম্মা, স্থূলাধরসম্পন্না অঙ্গনার লাবণ্য অর্চ্চনা করেন। কোন জাতি বা স্বর্ণবর্ণা, স্থির-নয়না, কৃষ্ণকেশী রমণীর রূপে মুগ্ধ হন! কোন জাতি বা চঞ্চললোচনা, দ্রুত-সজোর-পদ-বিক্ষেপিনী, শুক-পক্ষী তুল্য নাসাধারিণী কামিনীর দেহে সমধিক সৌন্দর্য্য দর্শন করেন। ফলতঃ এ বিষয়ে কুত্রাপি একতা দৃষ্ট হয় না। জামাইবারিকের কামিনী, তুমি সৌন্দর্য্য গর্ব্বে স্ফীতা হইয়া বেড়াইতেছ, কিন্তু দুই দিন পরে বুঝিবে, যে তোমার সৌন্দর্য্য কিছুই নহে। তুমি সুন্দরী হইলেও তোমার স্বামীর চক্ষে তুমি অতি অপদার্থ। কারণ তোমাতে তাঁহার চিত্ত নাই। যাহাতে তাঁহার চিত্ত অধিকার করিতে পার তাহার চেষ্টা কর, তাহা হইলেই তোমার রূপ বাড়িবে। অতএব তুমি বৃন্দাবন গিয়া স্বামীর চরণ ধরিয়া সাধনা কর।

হে কুটিল-কটাক্ষ-বর্ষিণী কামিনীগণ! হে মুকুরহস্ত সুন্দরি!

হে সৌন্দর্য্যগর্ব্বগর্ব্বিতা রমণীগণ! তোমরা ক্ষান্ত হও। তোমাদের রূপের বড়াই ত্যাগ কর। তোমাদের শরীরে এক বিন্দুও রূপ নাই; আমি তোমাদেরে তাই বলিয়া নিন্দনীয়া বা কুৎসিতা বলিতেছি না। হইতে পারে—তোমার লোচনযুগল পটলচেরা, বা ইন্দীবর তুল্য বা পদ্মপলাশবৎ; তোমার নাসিকা তিলফুল অপেক্ষাও উত্তম; তোমার পীনপয়োধর দাড়িম্ব অপেক্ষাও আশ্চর্য্য; তোমার বাহুদ্বয় মৃণাল অপেক্ষাও সুকুমার; তোমার অঙ্গুলি নিচয় চম্পক কুসুম সদৃশ; তোমার উরু-যুগল রামরম্ভা অপেক্ষাও ভয়ানক; তোমার বর্ণ কাঁচা হরিদ্রার ন্যায়, সংক্ষেপতঃ তোমার শরীর মহান্ অশ্বথ গাছ হইতে অতি ক্ষুদ্র ঘাস পর্য্যন্ত যাবতীয় বন জঙ্গলের আদর্শ স্থল, ইহা আমি স্বীকার করিলাম। বিনা ওজরে ইহাও স্বীকার করিতেছি যে, তোমার দেহস্থিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিন্যাস অতি মনোরম, কিন্তু মন না থাকিলে তুমি কোন্ কাজের? তোমার ওরূপ রাশি অতি ছার, নাক ফুঁড়িয়া তাহাতে দেড় মন নথ ঝুলাও, কান ফুঁড়িয়া তাহাতে রাজ্যসমেত বোঝা দোলাও, দুঃখ রাখ কেন; সোনার পাথর গলায় বাঁধিয়া বাসনা স্রোতে সাঁতার খেল, দিনে দুপুরে পুরুষ মহাজনদের মন চুরি করিয়া স্বয়ংই তার সাজা স্বরূপ অগ্রে পায়ে রূপার বেড়ী দিয়া আদরের কয়েদী হইয়া বসিয়া থাক, আর যা খুসী হয় তা কর; কিন্তু নিশ্চয় জানিও যে, তাতে রূপ বাড়িবে না, বরং কমিবে। তোমরা বাহির সাজাইতে চেষ্টা করিও না, তাহাতে কেবল হিতে বিপরীত ঘটিবে। দরিদ্র শিশু তোমাদের এবেশ দেখিতে পাইলে, কোন "নূতন জীব" দেখিলাম ভাবিয়া কাঁদিয়া ফেলিবে, আর জগদ্বিখ্যাত ভীরু বাঙ্গালী পুরুষ তোমাদের এই রণরঙ্গিণী বেশ দেখিয়া, বিশেষ সুধু মুখনাড়া নয়, উপরন্ত নথ নাড়ার ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিবে। তাই বলি তোমরা বাহির সাজাইতে চেষ্টা করিও না। নাক ফোঁড়া ফুঁড়িতে আর কাজ নাই, যাহাতে

আত্মার উন্নতি হয়, অন্তর সজ্জীভূত হয়, তাহার উপায় বিধান কর— তোমার রূপ রাশির কখন ধ্বংস হইবে না, তোমার পার্থিব কায় স্বর্গীয় মূর্ত্তি ধারণ করিবে, প্রেমিকের চক্ষে তোমার সৌন্দর্য্য অতুলনীয় বলিয়া বোধ হইবে। প্রেমিকের মনের গুণে তোমার রূপ। অতএব গুণের প্রলোভনে প্রেমিকের চিত্তকে ভুলাইয়া রাখ, তাহা হইলে তোমার রূপ বাড়িবে। আর হে নবীনা খ্রীষ্টীয়াঙ্গনা! তুমি আর কষ্ট করিয়া স্বীয় সুকোমল গণ্ডস্থলে পাউডার মাখাইও না, আর সোপ দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া দেহ কাতর করিও না, তাহাতে তোমার রূপ বাড়িবে না। যে তোমাকে সুরূপা বলিয়া জানে, সেই প্রেমিকের চিত্ত যাহাতে তোমার ব্যবহারে, তোমার গুণে আনন্দিত থাকে, তাহারই চেষ্টা কর—তোমার রূপরাশি কখন ভাঙ্গিবে না। দেখ পরম যোগী ঈশার শিষ্য কি বলিতেছেন "তোমরা কেশ বেশ ও স্বর্ণ অলঙ্কারে ভূষিতা না হইয়া বরঞ্চ শান্ত ভাবরূপ অক্ষয় শোভা বিশিষ্ট যে হৃদয়ের গুপ্ত মনুষ্য, সেই তোমাদের ভূষণ হউক, আর তাহাই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বহু মূল্য"। হে মানিনি! তুমি মান করিয়া নায়ককে পায়ে ধরাইয়া সাধাইতেছ, সাধাও—কিন্তু কেন তুমি তাহাকে প্রকারান্তরে জানাইতেছ যে, ভুবনে আর তোমার ন্যায় সুন্দরী নাই? যদি তুমি তাহাই বিবেচনা করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার নিতান্ত ভ্রম হইয়াছ। এখন কিরূপ স্ত্রীলোক যথার্থ সুন্দরী শুনিবে? যে স্ত্রীলোকের চর্ম্ম সুন্দর, আকৃতি সুন্দর, সে বাস্তবিক সুন্দরী নহে। দেখিতে সুশ্রী হইলে সুন্দরী হয় না। যাহার চিত্ত সুন্দর, সেই যথার্থ সুন্দরী।

বঙ্গীয় নাট্যশালা বা বাঁদরের হাতে খন্তা।

"পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।"—বিদ্যাসুন্দর।

আমাদের এই দুর্ভাগ্য বাঙ্গালি জাতির অবস্থা চিরকালই সমান। ভীরুতা, আলস্য, আমোদপ্রিয়তা, বাবুগিরি প্রভৃতি যেন সঙ্গের সঙ্গী মনে করিয়া ফুল বাবু মহোদয় এই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পৃথিবীটা কিছুই নয়, কেবল বাঙ্গালী মহাপুরুষগণের নাট্যশালা মাত্র—যদি কিছু করণীয় থাকে, তাহা ভাল খাওয়া, ভাল পরা, আর ভাল করিয়া আমোদ করা ভিন্ন কিছুই নয়—পৃথিবীতে আসিয়া এই নশ্বর জীবনে আর যে কিছু করিবার আছে, বাঙ্গালির উর্ব্বর মস্তিষ্কে তাহা স্থান পায় না—তাহা ধারণায় আইসে না। পৃথিবীস্থ তাবজ্জাতিই তারস্বরে উচ্চকণ্ঠে বাঙ্গালির এই মহা কলঙ্ক রটনা করিতেছে—তথাপি বাঙ্গালির উদ্বোধ নাই, চেতনা নাই, চিন্তা নাই, বিকার নাই, লজ্জা নাই, ভয় নাই, অচল, অটল, আপনার ভাবে আপনি বিভোর, "নির্ব্বাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্"।

বাঙ্গালির এই ঘোর দুর্নামের ও মহান্ দুরাবস্থার কারণ কি? পুরাবৃত্ত এরূপ সাক্ষ্য দেয় না, যে বাঙ্গালি আদিম কাল হইতেই এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত—বরং পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায়, যে অনেক বাঙ্গালি স্বীয় বাহুবলে আপনার রাজত্ব রক্ষা করিয়াছেন, পররাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন;—অনেক মহাপুরুষ জীবনোৎসর্গ করিয়া, পরহিতব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন; ধন, জন, বন্ধু, বান্ধব, স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাবলম্বন করিয়াছেন; বহ্বায়াসাধ্য পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বিজন অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তু পরিবৃত হইয়া, তপশ্চারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং ইহা স্থির নিশ্চয় যে, বাঙ্গালির আদিম অবস্থা কলঙ্কময় নহে—বাঙ্গালির আদি পুরুষেরাও কলঙ্কী নহেন।

তারপর মুসলমানদিগের অধিকার কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। কি কারণে হিন্দু রাজত্বের উচ্ছেদ ও মুসলমান সাম্রাজ্যের সংগঠন হয়, তাহা বিবৃত করা, এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। ইতিহাসজ্ঞগণ তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। এক্ষণে দেখা যাউক, মুসলমান রাজত্বে বাঙ্গালি সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা কিরূপ ছিল। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, রাজার রীতি, রাজার নীতি, রাজার ধর্ম্ম, রাজার কর্ম্ম, প্রভৃতি প্রজাদিগের অনুকরণীয় হইয়া উঠে—অন্ততঃ তাহা প্রচলিত করিবার জন্য রাজাও বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন। মুসলমানেরা যখন এ দেশে আইসেন, তখন তাঁহারা মহাবীর, অমিত সাহসী সুনিপুণ যোদ্ধা, কিন্তু দারুণবিলাসী। বাঙ্গালি মহোদয় আয়াস সাধ্য ব্যাপারে কখনই হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক নহেন, সুতরাং মুসমানদিগের নিকট বিলাসিতা শিখিতে আরম্ভ করিলেন। মুসলমানদিগের প্রত্যেক কার্য্যে প্রত্যেক কথায় বিলাসিতা জাজ্বল্যমান—এমনকি মুসলমানী শব্দ পর্য্যন্ত বিলাসিতার পরিপোষক হইয়াছিল। এখনও "নবাব" বলিলে বোধ হয়, যেন বিলাসীপ্রধান একটী জীব। সুতরাং দেখিতে গেলে মুসলমানদিগের অধিকার কালেই বাঙ্গালিদিগের অধঃপতন আরম্ভ হয়, কিন্তু তখনও বাঙ্গালিবীরের সাহস, তেজ, বল, বীর্য্য একেবারে লোপ পায় নাই। ইতিহাস তাহার জ্বলন্ত সাক্ষী।

তাহার পর সুসভ্য, সুশিক্ষিত, সুনীতি সম্পন্ন সুবিখ্যাত বৃটীশ রাজাধিকার কাল। বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিতে বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন জাতিই বৃটনের সমকক্ষ নহেন। অমিত তেজে অমিত বাহুবলে, অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলে ও অসামান্য শিক্ষা নৈপুণ্যে এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন। সুতরাং এবম্বিধ রাজার অধিকার কালে প্রজা মাত্রেই যে সর্ব্বতোভাবে সুখী হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? রাজাও প্রজার উন্নতিসাধনে

সুতৎপর। উচ্চশিক্ষা দান, উচ্চ বিচারালয়ের শাসন ভারার্পণ, বিধি সমিতিতে স্থান প্রদান প্রভৃতি উচ্চ কার্য্যে নিয়োগ করিয়া বাঙ্গালির মাহাত্ম্য বাড়াইতেছেন। কিন্তু হইলে কি হয়, বাঙ্গালির জাতিগত অভ্যাস কিছুতেই দূর হইতেছে না।—মুসলমানেরা যে কি এক বীজমন্ত্র বাঙ্গালির কানে ফুঁকিয়া দিয়াছে, বাঙ্গালি কোন ক্রমেই সে জপ আর ছাড়িতেছে না।

কয় জন বাঙ্গালি বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য যত্ন পরায়ণ? কয়জন বাঙ্গালি জ্যোতিষের মর্ম্মোদ্ঘাটনে উন্মুখ? কয় জন বাঙ্গালি বেদের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার্থ যত্নশীল? কয় জন বাঙ্গালি ষড়দর্শন পাঠে অগ্রসর? তুলনায় ধরিতে গেলে হাজারের মধ্যেও একজন পাওয়া সুকঠিন! কিন্তু বিদ্যাসুন্দর পড়ে নাই, উপন্যাস পড়ে নাই, প্রেতন্যাস পড়ে নাই, নাটক পড়ে নাই, এমন বাঙ্গালি বোধ হয় খুব কমই আছে। ইহা বাঙ্গালির দুর্ভাগ্যের ফল ভিন্ন আর কি বলিব? বাঙ্গালি বুঝেনা যে, আমাদের এ আমোদের সময় নয়—এখন কাঁদিবার সময়! এ আমাদের সুখের সময় নয়, কষ্টের সময়!

সে যাহা হউক বাঙ্গালি যখন এতই আমোদপ্রিয়, রঙ্গ প্রিয়; তখন এই আমোদের মধ্যে, রঙ্গের মধ্যেও যাহাতে সুশিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহা করা কি শিক্ষিত মণ্ডলীর সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য নয়? নাট্যশালা এ বিষয়ের প্রধান উপযোগী, এবং নাট্যশালার সৃষ্টিও বোধ হয়, সেই উদ্দেশ্যে। কত দূর সফল হইয়াছে, তাহা দেখা আবশ্যক!

কলিকাতা একটি মহা নগরী, এবং সর্ব্বপ্রকার সামাজিকতার এক মাত্র অধিষ্ঠান স্থান। এই কলিকাতায় বাঙ্গালির জন্য দুইটী নাট্যশালা আছে। একটির নাম জাতীয় রঙ্গভূমি, অপরটি বঙ্গরঙ্গভূমি। কলিকাতা বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানবাসীদিগের সুনীতি শিক্ষার জন্যই

হউক, বা আমোদ প্রদানের জন্যই হউক, এ দুইটী স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে উহা হইতে যে কোন উদ্দেশ্যেই সিদ্ধ হইতেছে না, এ কথা আমরা সহস্র মুখে বলিব। পূর্ব্বে যাহাই থাকুক, এক্ষণে রঙ্গালয় গুলি অর্দ্ধ শিক্ষিত যুবা ও বেশ্যার আবাস স্থান হইয়াছে, তাহাদিগের উপজীবিকার হেতু হইয়াছে, নিতান্ত পেশাদার হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে যে সকল বিষয় অভিনীত হয়, তাহা সুনীতি ও সদামোদের প্রবর্ত্তক না হইয়া, কুনীতি ও কুরুচির পরিপোষক হইয়াছে। রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ দেশের মুখ না চাহিয়া, দেশকে উৎসন্ন দিবার জন্য, নানা বিষয়ের অবতারণা করিতেছেন; এবং আশাতিরিক্ত সহানুভূতি পাইয়া দ্বিগুণ বলে বদ্ধপরিকর হইতেছেন, কেননা বাঙ্গালি জাতি উৎসন্ন যাইতে বড় মজবুত! ফলতঃ অধুনা রঙ্গভূমির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। প্রকাশ্যভাবে ইহাতে যে সকল বিষয়ের অভিনয় হয়, তাহা কেবল নীতি বিগর্হিত নয়, লোক বিগর্হিত, সমাজ বিগর্হিত, ধর্ম্ম বিগর্হিত! উহা দেখিয়া আমোদ হয় না, লজ্জা হয়; প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয় না, দগ্ধ করিয়া ভস্মসাৎ করিতে ইচ্ছা হয়।

আমরা যে বিষয় অবলম্বন করিয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি, এক্ষণে তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। কয়েক সপ্তাহ হইতে বঙ্গ রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ "ব্রজলীলা" নামক এক খানি নাট্য গীতির অভিনয় করেন। উপর্য্যুপরি বিজ্ঞাপন দৃষ্টে বোধ হইয়াছিল, না জানি "ব্রজলীলা" কি অপূর্ব্ব পদার্থ! নতুবা এত অধিকবার অভিনীত হইবে কেন? কৌতূহলপরবশ হইয়া রঙ্গভূমে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহার পরিচয় এই বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে, নিতান্ত বাঙ্গালীর সন্তান বলিয়া আদ্যোপান্ত শুনিতে ও দেখিতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

বটতলার কথা ছাড়িয়া দিয়া বলিতেছি যে, যখন যে কোন

পুস্তক পাঠ করি, তখন তাহা হইতে একটা না একটা সদুপদেশ পাইয়া থাকি। সকল পুস্তকেই ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়, সৎকর্ম্মের ফল, অসৎকর্ম্মের পরিণাম, প্রণয়ীর সাফল্য, অপ্রণয়ীর নিরাশা এমনি কিছু না কিছু একটা আছেই আছে। বিষবৃক্ষ পাঠে সূর্য্যমুখীর পতিভক্তি, কুন্দনন্দিনীর সরলতা, নগেন্দ্র দত্তের নির্ব্বুদ্ধিতা, দেবেন্দ্রের পাপের ফল জানিতে পারি। জামাইবারিক পাঠে একাধিক ভার্য্যা গ্রহণের পরিণাম, ঘর-জামায়ের দুর্দ্দশা, অহঙ্কৃতা বণিতার অনুতাপ উপলব্ধি হয়, ইত্যাদি। কিন্তু ব্রজলীলা পাঠে কি জানা যায়, পাঠকবর্গ একবার অনুধাবন করুন।

ব্রজলীলার প্রধানতঃ তিনটি বিষয় আছে। গোপিনীর বস্ত্রহরণ, চন্দ্রাবলীর অভিসার, আর রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন। বিষয়গুলি কিরূপ মনোহর ও ভদ্র সমাজের অনুমোদিত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। ইহার উপর আবার রচনা কৌশল আছে। আমরা এবম্বিধ কুৎসিৎ বিষয় পাঠকগণের কর্ণগোচর করিতে লজ্জা বোধ করি, কিন্তু না করিলেও চলে না।

ব্রজলীলার প্রথম দৃশ্য যমুনার জলে আবক্ষমগ্না ব্রজবালাগণ। এই দলে রাধিকা আছেন, বৃন্দা আছেন, ললিতা আছেন, বিশখা আছেন, চন্দ্রাবলি প্রভৃতি সকলেই আছেন! ইহাঁরা সকলে নিজ মুখেই বলিতেছেন যে, কাল রাত্রে 'বঁধুয়া বিহনে' সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছি (আও আও অলি ইত্যাদি গীত), 'মদন দহনে' শরীর জ্বলিতেছে, সেই জ্বালা জুড়াইবার জন্য লজ্জা সরম ভুলিয়া কাঁচরি, দুকুল কূলে রাখিয়া এস জল খেলা করি। কথামত কাজ হইল। তারপর রাধিকা বলিলেন যে, "সইরে জলের ঢেউ গুলা' ভাঙ্গিয়া দাও, ঢেউগুলা বুকের কি জানি কোথায় 'এসে বসে' আমার মাধুরী দেখিতেছে, আমি তাহা সহিতে পারিনা। সখিগণ সে কথা শুনিল কি না জানি না— ব্রজলীলাতেও তাহা নাই, কিন্তু সখিগণ আর একটি মতলব করিয়া-

ছিল, তাহারা বলিল "যমুনার কাল জলে" শরীর ভাসাইয়া দিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া চল এমন দেশে যাই, যেথানে "শাশুড়ী বাঘিনী, "ননদী নাগিনী"র গঞ্জনা সহিতে হইবে না, অথচ আমরা দিবা নিশি কালাকে লইয়া পরম সুখে থাকিব। কিন্তু এসকল গেল স্ত্রীলোকের মনের কথা, উহা সমালোচনা করিবার আমাদের কোন অধিকারই নাই। কিন্তু আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, এরূপ বেশ্যামূর্ত্তিতে ব্রজবালাগণকে রঙ্গভূমিতে আনিয়া, এই অসহায় নিরূপায় মগ্ন প্রায় বাঙ্গালি সন্তানকে ডুবাইবার চেষ্টা না করাই অধ্যক্ষগণের উচিত ছিল।

যাহা হউক, ইহার পর শ্রীকৃষ্ণের পালা পড়িল। শ্রীকৃষ্ণ, বোধহয় গোপিনীদিগের বাটিতে কাহাকেও না দেখিয়া, এইদিকে আসিতেছিলেন, হঠাৎ দেখিতে পাইলেন "সোনার কমল জলে ভাসে।" শ্রীকৃষ্ণ আহ্লাদে আটখানা হইয়া, ব্রজবালাগণের জলক্রীড়া দেখিবার জন্য অন্তরালে দাঁড়াইলেন; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ দেখিতে দেখিতে বোধ হয়, তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি আর অন্তরে থাকিয়া—অন্তরালে থাকিয়া—তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না, ক্রমে অগ্রসর হইলেন, তাঁহার আমোদ আরও বৃদ্ধি পাইল, তিনি দেখিলেন,—

'বিবসনা ব্রজাঙ্গনা যমুনাসলিলে,
রঙ্গে ভঙ্গে সোনার অঙ্গ অপাঙ্গে নেহালে।'

এই দেখিয়া ভাবিলেন,—

'নাগরীরে দিয়া ফাঁকি, ঘাঘরি লুকায়ে রাখি,
লাজেতে মুদিবে আঁখি, কূলেতে উঠিলে॥'

এই ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্র সকল লইয়া, যমুনার তটস্থ কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিলেন।

কি ভয়ানক দৃশ্য! কি কুৎসিৎ দৃশ্য! কি পাপ দৃশ্য! যাহা মনে

ভাবিতেও ঘৃণা হয়, বঙ্গরঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ কিনা তাহাই সাধারণ সমক্ষে অভিনয় করিতেছেন, বাহবা লইতেছেন, অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন!

এখন বেলা অবসান হইয়া আসিল, ব্রজবালাগণ যমুনার জলে অঙ্গ ভাসাইয়া শাশুড়ী ননদিনীর গঞ্জনা এড়াইবার জন্য কোন দূর দেশে যাইতে পারিলেন না। এদিকে অনেকক্ষণ জলে পড়িয়া থাকাতে, মদনদহনও অনেকটা শীতল হইয়াছিল, সুতরাং বাড়ী যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি বাড়িল। জল হইতে উঠিয়া দেখেন—সর্ব্বনাশ! "কুরতি, কাঁচরি, আঙিয়া, ঘাঘরি" কে হরণ করিয়াছে; ব্রজবালাগণের মুখ শুকাইয়া গেল, অগত্যা কক্ষজলে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় কদম্ব বৃক্ষ হইতে বংশীধ্বনি হইল। ব্রজাঙ্গনাগণ চমকিয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বসন চুরি করিয়া বসিয়া আছেন। অনেক কাকুতি মিনতি করা হইল, শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, পরিহাস পূর্ব্বক কহিলেন,—

"কটি বেড়ি কলকলে, যমুনা লহর চলে,
ঢাকিতেছে হৃদি-ফল, চারু করতলে॥
লাজমাখা আঁখি হতে, মতিঝোরা ঝরে।
এলোকেশী শশিমুখী মরি স্মর-শরে॥"

ইহাতে ব্রজবালাগণ কহিলেন, তুমি স্মর-শরেই মর, আর যাহাই হও, আমরা তোমায় ফিরিয়া দেখিব না, যেহেতু তুমি চোর, ননি চুরি করিয়াছিলে, আবার বস্ত্র চুরি করিয়াছ। তখন ব্রজাঙ্গনাগণ সূর্য্যদেবকে আরাধনা করিলেন,—

"সাধি হে তপন, হর হে কিরণ
আলোক ঝলকে, হৃদয় গোলক,
বাস হরি হেরে গোলক-বিহারী॥"

গোলোক বিহারীও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি বলিলেন,

"জল মাঝে আলো ঢেলে দেখ দিনমণি,
সলিলে বিরলে রত্ন রেখেছে গোপিনী ॥"

আর লেখনী চলেনা! এ পাপচিত্র আর লিখিতে পারি না! দুর্ভাগ্য বঙ্গ সন্তানের কালিমাময় জীবনী আর লিখিতে পারি না। যাহা লিখিবার তাহা লিখিয়াছি, আর লিখিতে পারি না! কি ভয়ানক! কি কুৎসিত। কি পাপময়! যাঁহারা এরূপ—পৈশাচিক ঘটনা—বীভৎস ঘটনা শত শত নরনারী সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারেন, তাঁহারা যে কীদৃশ জীব, তাহা প্রাণিবৃত্তান্তে লেখে না; তাঁহারা কি নামে সম্বোধিত হইবার যোগ্য, অভিধান তাহা বলে না! আর যাঁহারা ঈদৃশ ঘটনা শীতল রক্তে দর্শন করেন, আমোদের চক্ষে দর্শন করেন—তাঁহারাই বা কীদৃশ জীব, তাহাও বলিতে পারি না!

এক্ষণে রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণের প্রতি আমাদের সানুনয় নিবেদন, তাঁহারা যেন স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, এই ছয় কোটি বাঙ্গালির মাথা খাইতে চেষ্টা না করেন। তাঁহাদিগকে নিন্দা করা তাঁহাদের অমঙ্গল কামনা আমাদের অভিপ্রেত নহে। তাঁহাদের কার্য্য যেরূপ গুরুতর সেই গুরুত্বের, অপব্যবহার দেখিলে হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছিল, হৃদয়ে আঘাত লাগিয়া থাকে বলিয়াই, এত কথা বলিয়াছি। অর্থাগমের অপর শত সহস্র উপায় আছে! আমরা ভিক্ষা চৌর্য্য বৃত্তিকে বরং দোষ না ভাবিতে পারি, কিন্তু বাঙ্গালির মাথা খাওয়া বৃত্তিকে কখনই ক্ষমা করিতে পারি না। ইতি।

চৈতন্য কি পূর্ণব্রহ্ম ? *

"চৈতন্য ভগবদ্ভক্ত নচ পূর্ণ নচাংশ"

ভারতবর্ষে যে কয়েকটী ধর্ম্ম প্রচারক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শিরোনামাঙ্কিত মহাত্মাই শেষ। পুরাণাদিতে বিষ্ণুর দশ অবতার বিষয়ে যেরূপ লিখিত আছে, যদিও আমরা চৈতন্যাবতারের বিষয় তাহাতে কিছুই পাইতেছি না, তথাপি তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার ও উদারতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পূর্ণ বা অংশ রূপে ঈশ্বর জানিত বলিয়া ভক্তি করিতে পারি। অসাধারণ অধ্যবসায়, পাণ্ডিত্য এবং ত্যাগ স্বীকারে তিনি কোনও অংশেই শাক্য সিংহ হইতে ন্যূন নহেন। মহাত্মা চৈতন্যের প্রচারিত মত লইয়া সংস্কৃত শাস্ত্রের আকর স্থান-নবদ্বীপে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। একদল প্রমাণ করিতেছেন, চৈতন্য "পূর্ণব্রহ্ম" †। অন্যদল প্রমাণ সহ দেখাইতেছেন, চৈতন্য "পূর্ণব্রহ্ম নয়।" উভয় দলই পণ্ডিত দ্বারা চালিত হইতেছে। চৈতন্যের পূর্ণ-ব্রহ্মত্বে যাঁহারা বিশ্বাসী, সেই দলের অধি-

* চৈতনের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্নের বক্তৃতা।

† "কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোহং মহীতলে।
ভাগীরথী তটে রম্যে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥"—পদ্মপুং।
"অহমেব কলৌ বিপ্র নিত্যং প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্রক্ষামি সর্ব্বথা॥—নারদীয়ে"॥
কলিনা দহ্যমানানাং পরিত্রায় তনুভৃতাং
জন্ম প্রথম সন্ধ্যায়াং করিষ্যামি দ্বিজাতিষু"।—গরুঁর পুং।
অহং পূর্ণ ভবিষ্যামি যুগ সন্ধৌ বিশেষতঃ।
মায়াপরে নবদ্বীপে বারমেকং শচীসুতং॥"—যামল।

স্মার্ত্ত বাবাজী বোধ হয় এই সমস্ত বচন দেখিয়া বা নীচ লোকের নিকট অর্থাকাঙ্ক্ষী হইয়া, চৈতন্যের পূর্ণ ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদনে সচেষ্ট হইয়াছেন, বাবাজী মনে রাখিবেন, এগুলি যবনাধিকারের জাল পুরাণ বা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক।

পতি অশীতিপর বৃদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন। বিরুদ্ধ দলের নেতা অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক মহাত্মা ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন। উভয়েই দিগ্‌গজ্।

শিরোনামাঙ্কিত মহাত্মা চৈতন্য দেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্র সহধর্ম্মিণী শচীদেবী সহ অনুমান চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে গঙ্গাবাসোপলক্ষে নবদ্বীপে বাস করেন, ইনি বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। পুত্র কন্যাতে ইহাঁর দশটি সন্তান হইয়াছিল, তন্মধ্যে বিশ্বরূপ ও চৈতন্য মাত্র দীর্ঘজীবি হইয়াছিলেন। মহাত্মা চৈতন্য দেব ১৪০৭ শকে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে জন্ম পরিগ্রহ করেন। ভাগ্যক্রমে ঐ দিবস চন্দ্র গ্রহণও হইয়াছিল। এমন শুভ লগ্নে শচী সন্তান প্রসব করিলেন দেখিয়া, জন সাধারণ প্রসূত সন্তান অবশ্য দেবানুগৃহীত বা বিষ্ণুর কোনও অবতার হইবেন এরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। এই সময় অদ্বৈতাচার্য্যের স্ত্রী নবদ্বীপে উপস্থিত ছিলেন, তিনি পরম সুন্দর শিশুর সুলক্ষণাক্রান্ত মুখ নিরীক্ষণ করিয়া আহ্লাদে প্রচুর ধন বিতরণ করিলেন এবং নব প্রসূত শিশুর নাম নিমাই রাখিলেন। যাঁহারা মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা শঙ্করের তিন বৎসরের সময় বেদ পাঠারম্ভ ও ৭ বৎসরের সময় পাঠ সমাপন দেখিয়া যেমন আহ্লাদিত হইয়া থাকেন, চৈতন্য দেবের জীবনীতেও তদ্রূপ আহ্লাদের বিষয় অনেক আছে। বোধ হয় চৈতন্যের মাতাও বিদ্যাবতী ছিলেন। সর উইলিম জোন্স যেমন তদীয় মাতার নিকট প্রথম শিক্ষা প্রাপ্ত হন, চৈতন্য দেবও তদ্রূপ শচীদেবীর নিকট বাচনিক বহু যুক্তিযুক্ত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোনও সময় খেলা করিতে করিতে চৈতন্য মাটি খাইয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে শচীদেবী অনুযোগ করিয়া কহিলেন, বৎস! মাটি খাইতে নাই। চৈতন্য তৎক্ষণাৎ প্রতিভা বলে বলিলেন, মা! সমুদায় বস্তুই মাটি, মাটি বিকৃত হইয়াই বৃক্ষাদি-

রূপে পরিণত হয়, যদি উদ্ভিদ ভক্ষণ ব্যবস্থা সিদ্ধ হয়; তবে মাটি ভক্ষণ করায় কি দোষ? মাতা বলিলেন বস্তু মাত্রের স্বাভাবিক ও বিকৃতাবস্থা সমগুণ বিশিষ্ট নহে। তখন চৈতন্য নীরব হইয়া রহিলেন। পাঠক, শিশুর প্রতিভা দেখ! চৈতন্যের এই মহা বাক্যটির প্রত্যেক অক্ষরে দর্শন শাস্ত্রের মূল তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে চৈতন্য পঞ্চম বর্ষে উপনীত। জগন্নাথ মিশ্র তখন নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে চৈতন্যকে অধ্যয়নার্থে প্রেরণ করিলেন। চৈতন্যদেব,স্বীয় স্মৃতিশক্তি ও অসাধারণ অধ্যবসায় বলে, অল্প দিনের মধ্যেই ব্যাকরণ সমাপ্ত করিলেন, এদিকে চৈতন্যের অগ্রজ বিশ্বরূপ সংসারে বীততৃষ্ণ হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনাভিপ্রায়ে দণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক, জনক জননীকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ইহার অব্যবহিত কাল পরে এবং চৈতন্যের পাঠ সমাপনের পূর্ব্বেই পিতা জগন্নাথ মিশ্র পরলোকস্থ হন। এক্ষণে চৈতন্য সংসারে মহা বিপদগ্রস্ত, দুঃখিনী মাতার এক মাত্র পালক ও সেবক; সুতরাং সত্বরেই পরিণয়ার্থী হইয়া স্থানে স্থানে ঘটক প্রেরণ করিলেন, বহু অন্বেষণের পর বনমালী ঘটক, বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত চৈতন্যের বিবাহ দিয়া চৈতন্যকে গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট করাইলেন।

চৈতন্য লক্ষ্মীদেবীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, এমন সময় অর্থাৎ চৈতন্যের ২০ বৎসর বয়ক্রম কালে চৈতন্যের গৃহে ঈশ্বর পুরীবর নামক একজন পরম বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ অতিথি হয়েন, তিনি চৈতন্যের অলৌকিক রূপ এবং উদারতা দেখিয়া তাঁহাকে শিষ্য করিবার মানসে চৈতন্যের সহিত শাস্ত্রালাপ ও বৈষ্ণব গ্রন্থাদি লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব বিশুদ্ধ বৈষ্ণব বংশজাত, তাহাতে আবার ভাগবতাদি ভক্তি প্রদায়ক গ্রন্থে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। পুরীবর সহজে চৈতন্যকে

পরম বৈষ্ণব করিয়া তুলিলেন, ক্রমেই চৈতন্যের নিকট সংসার বিষবৎ, সমুদ্রের ফেণবৎ বোধ হইতে লাগিল। তিনি সর্ব্বদা নিবিষ্ট চিত্তে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং জয়দেব প্রভৃতির বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠ করিতেন এবং সময় সময় কৃষ্ণ প্রেমে মুগ্ধ হইয়া উন্মাদের ন্যায় হইতেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হয়, হঠাৎ এক দিবস চৈতন্য গভীর রজনীযোগে মাতা স্ত্রী প্রভৃতি আত্মীয়দিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরীবরের সহিত প্রস্থান করেন। * জাগ্রত হইয়া বাটীস্থ সকলে দেখিলেন, চৈতন্য নাই। অনুমান করিলেন, অতিথি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। শচীর মস্তকে বজ্রপাত হইল। শচীর দশটী পুত্র কন্যার মধ্যে আটটীই অকালে কাল গ্রাসে পতিত হয় দুইটী মাত্র পুত্র ছিল তাঁহারাও সন্ন্যাসী হইলেন দেখিয়া শোকে ক্ষিপ্ত প্রায় হইলেন। লক্ষ্মীদেবী স্বামী শোকে ম্রিয়মাণা হইয়া শ্বশ্রূর সেবা করিতে লাগিলেন, এদিকে চৈতন্য কাটোয়ায় ভাগীরথী ঘাটে পুরীবরের নিকট কৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তীর্থ যাত্রায় দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন, তিনি গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বেড়াইয়া হরি নাম প্রচার করিতে লাগিলেন। এই সময় বঙ্গদেশের প্রতি গৃহস্থই তান্ত্রিক ছিলেন এবং তন্ত্র মতে মদ্য মাংস পান করিয়া শক্তির আরাধনা করিতেন, চৈতন্য এই জঘন্য তান্ত্রিক মতের বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া তর্ক করিতে লাগিলেন। তাঁহার তর্কের মোহিনী শক্তিতে ও হরিনাম প্রচারের অসাধারণ একাগ্রতায় মুগ্ধ হইয়া অনেক লোক বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। এই সময় আকবর বাদসাহের প্রধান

* অতিথি হইয়া রাত্রিযোগে চৈতন্যকে লইয়া প্রস্থান করায় নবদ্বীপে এখনও রাত্রিতে অপরিচিত ব্যক্তি আশ্রয় পায় না। প্রবাদ এই—'নিমাইর মা নিমাইর মাথা খেয়েছ। অচিনা অতিথিকে রাত্রে জায়গা দিয়েছে।' আরও অন্য প্রবাদ—শচীর উক্তি—"রাত্রে জায়গা দিবে যে, আমার মত হবে সে।"—বক্তা।

অমাত্য রূপসনাতন মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যের শিষ্য হইলেন, চৈতন্য সমস্ত নর নারীকে একপ্রেম সূত্রে গ্রথিত করিতে মানস করিয়া, চতুর্ব্বর্ণকে এক বর্ণরূপ মালায় গ্রন্থন করিলেন। বঙ্গে চাতুর্ব্বর্ণের যে জাতি বিচার ছিল, তাহার গ্রন্থিও শিথিল হইতে লাগিল।

যৎকালে চৈতন্যদেব পুরীবরের নিকট কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, হরিনাম প্রচারে ব্রতী হয়েন, বাঙ্গালীর তৎকালের চিত্র যে কিরূপ ভয়ানক ছিল, তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়ে হৃতকম্প উপস্থিত হয়। বৈদিক ক্রিয়া কলাপের পর মহাত্মা শাক্য সিংহের বৌদ্ধমত প্রচারিত হইবামাত্র, একদিন সমস্ত ভারত বাসী বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। তারপর যতীন্দ্র শঙ্করাচার্য্য ও উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কর্ত্তৃক বৌদ্ধমত বিদূরিত হইলে, পুনর্ব্বার বৈদিক ক্রিয়া কলাপ আরম্ভ হয়, নামে মাত্র "বৈদিক ক্রিয়া"; কারণ এই সময় বঙ্গে সহস্রের মধ্যে একজনও বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন কিনা, সন্দেহ। স্মৃতির কঠোর শাসন ভারে নিপীড়িত হইয়া বৈদিক ক্রিয়া কলাপের উপর আর লোকের তত আস্থা ছিল না, এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে, পূর্ব্ব বাঙ্গালার (ঢাকা জেলার) সর্ব্ব বিদ্যা নামধারী জনৈক তান্ত্রিক পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়া আপনার অলোকসামান্য পাণ্ডিত্য ও ক্ষমতায় তন্ত্র প্রচারে বঙ্গদেশ উচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকার প্রায় বঙ্গের প্রতি গৃহেই স্থাপিত ছিল। এই তন্ত্র প্রচার দ্বারা জাতিভেদ ও বৈদিকধর্ম্মের অনেকটা শাসন তিরোহিত হয়, তাঁহাদিগের মতে এক সময়ে সকল জাতির একত্রে ভোজন পান দোষাবহ নহে, "প্রবৃত্তে ভৈরবী চক্রে সর্ব্বেবর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ। নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্।"

এদিকে বঙ্গের শীর্ষ স্থানীয় নবদ্বীপের ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মতেজ লোপ পাইয়া উঠিল। কাজেই সাধারণে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া নাস্তিক

প্রায় হইয়াছিল। দেশের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা এবং মানবের এইরূপ নিরীশ্বর ভাব নিরীক্ষণে চৈতন্যের হৃদয় গলিয়া গেল, তিনি সমাজকে বাত্যাকুলিত সাগরের ন্যায় আলোড়িত করিয়া তুলিলেন, এবং সংসারের সমস্ত ভোগ বাসনাকে বলি রূপে উৎসর্গ করতঃ হরিনাম প্রচারার্থে বহির্গত হইলেন। এই সময় নিত্যানন্দ ঠাকুর, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, মুরারী ও মুকুন্দ গুপ্ত প্রভৃতি কতিপয় সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, চৈতন্যের সঙ্গী হইলেন। মহাত্মা চৈতন্যদেব কাটোয়াতে কিছু কাল হরিনাম প্রচার করিয়া, মালদহ জেলার রামকেলী নামক স্থানে সশিষ্যে গমন করেন; এবং অল্প দিনের মধ্যে তথাকার সমস্ত জাতিকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। চৈতন্য দেবের স্মরণার্থে সেই সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত আষাঢ় মাসের শেষে তথায় একটি মেলা ও মহোৎসব হইয়া থাকে। যাহা হউক তথা হইতে গৌড়ের নিবিড় অরণ্য দিয়া গমন করিবার সময় এক দিবস হঠাৎ একটী প্রকাণ্ডকায় শার্দ্দূল আসিয়া চৈতন্য দেবকে আক্রমণ করে। তদ্দৃষ্টে চৈতন্য দেব সঙ্গী শিষ্যদিগকে বলিলেন, দেখ! এই কৃষ্ণের জীব হরিনামামৃত পানাশয়ে আমার নিকটস্থ হইয়াছে, আইস; আমরা উহার কর্ণে হরিনাম প্রদান করি, এই বলিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমোন্মত্ত হৃদয়ে সেই যম-কিঙ্কররূপী শার্দ্দূলকে ক্রোড় প্রদান করেন। প্রবাদ পরম্পরায় কথিত আছে, ব্যাঘ্র চৈতন্যের সেই অমানুষী ভাব সস্পৃহ নয়নে কিছু-কাল নিরীক্ষণ করিয়া বন মধ্যে প্রবেশ করে। মহাত্মা চৈতন্য দেব এই সময় জগাই মাধাই নামক দুইজন অতি দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তিকে কৃষ্ণ মন্ত্র প্রদান করেন। তাঁহার নিকট সকলেই কৃষ্ণের জীব, তিনি সমুদায় বস্তুই কৃষ্ণময় নিরীক্ষণ করিতেন, কৃষ্ণের যে ঈশ্বরত্ব জয়দেব ও বিদ্যাপতি প্রভৃতি মধুর রসে বর্ণনা করিয়া গিয়াছিলেন, মহাত্মা চৈতন্যদেব কৃষ্ণের সেই ঈশ্বরত্বে মোহিত হইয়া বঙ্গের দ্বারে দ্বারে

নগরে নগরে তাঁহার নাম প্রচার করিতে লাগিলেন। এই স্থান হইতে গয়া নগরীতে গমন করেন এবং তথায় যাইয়া অনেক বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলী লোক প্রাপ্ত হন। চৈতন্যদেব এই স্থানে প্রায় দেড় বৎসর হরিনাম প্রচার করিয়া—সেতুবন্ধ রামেশ্বর গমন করেন। তথায় পূর্ব্ব হইতেই রামানুজ সম্প্রদায়ের কতিপয় বৈষ্ণব ছিল, তাহারা চৈতন্যদেবকে অবতার বলিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। পরে সেতুবন্ধ হইতে পুরী ক্ষেত্রে উপস্থিত হন এই সময় তাঁহার সঙ্গে প্রায় সহস্র শিষ্য ছিল, চৈতন্যদেব জগন্নাথ দর্শন করিয়া এমন মোহিত হইয়া ছিলেন যে, রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে তিনি সংজ্ঞা শূন্য হইয়া অনবরত এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া ছিলেন।—

"প্রিয়ঃ সোয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিতস্তথা হংসারাধা;
তদিদমুভয়োঃ সঙ্গম সুখং।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলী পঞ্চম জুষে।
মনোমেকালিন্দী পুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি॥"

এবংএক দিবস প্রেমোন্মত্ত হইয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। এই সময় পুরীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পরম ভাগবত গোবিন্দ শাস্ত্রীর সহিত তাঁহার আলাপ হয়। শাস্ত্রী প্রত্যহ বেদান্ত পাঠ করিয়া চৈতন্যকে শুনাইতেন, চৈতন্য নীরবে শাস্ত্র শুনিয়া যাইতেন। এক দিবস শাস্ত্রী বলিলেন মহাত্মন্! আপনি কেবল শুনিয়া যাইতেছেন, আমি যে বেদান্ত পাঠ ও ব্যাখা করি, তাহা বুঝিতে সমর্থ হনতো? তদুত্তরে চৈতন্য বলিলেন, শাস্ত্রি! আপনি আমায় শুনিতে বলিয়াছেন, প্রশ্ন করিতে তো বল্লেন নাই, দেখুন আপনি এই সপ্তাহ ব্যাপী যে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমি সমস্তই অভ্যাস করিয়াছি। ইহা বলিয়া চৈতন্য, শাস্ত্রী যে দিন যে বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন অবিকল অনর্গল বলিতে লাগিলেন, তচ্ছ্রবণে শাস্ত্রী বলিলেন, আপনি সত্য সত্যই

গৌরাঙ্গ অবতার ও কলির পাপ ক্লিষ্ট মানবের মুক্তিদাতা, ইহা বলিয়া তিনি চৈতন্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

চৈতন্য এইরূপে বহুদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া পুনর্ব্বার মাতার চরণ দর্শন মানসে নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে বহু শিষ্য ও আসিয়াছিল। শচী দেবী বহু কালের পর হারাধন নিমাইকে পাইয়া, যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন, আর বলিলেন, বাছা! আমাকে ছাড়িয়া আর কোথাও যাইওনা। চৈতন্য মাতার নিকট তীর্থ যাত্রার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বলিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণ প্রেমে মুগ্ধ হইয়া হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। চৈতন্য পরম বৈষ্ণব হইয়া দেশে আসিয়াছেন শুনিয়া সহস্র সহস্র পণ্ডিত ও বৈষ্ণব তাঁহার গৃহে সমাগত হইতে লাগিলেন, এবং খোল করতাল লইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই সময় চৈতন্যের গৃহ এক অভূত পূর্ব্ব নূতন বেশ ধারণ করিল, কোথাও বা কোনও শিষ্য তানলয় বিশুদ্ধ স্বরে ভাগবত পাঠ করিতেছেন, কেহবা বিদ্যা পতির সুমধুর গীত দ্বারায় শ্রোতৃবর্গের মনোহরণ করিতেছেন, কেহবা নবদ্বীপস্থ নীরস তার্কিকদিগের সহিত ন্যায় সাংখ্য লইয়া শাস্ত্র যুদ্ধ করিতেছেন, শিষ্যগণ চৈতন্যের নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিলে তিনি সমস্ত বাক্যের অর্থই কৃষ্ণ পক্ষে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এক দিবস শচী ঠাকুরাণী চৈতন্যকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! অদ্য কিসের ব্যাখ্যা করিয়াছিলে। তিনি বলিলেন মা! অদ্য কৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিতেছিলাম। ভাগবতে কৃষ্ণ নামের বিষয়ে লিখিত আছে—

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরি ভক্তি ন দৃশ্যতে।
নশ্রোতব্যং নবক্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥
নযত্র বৈকুণ্ঠ কথা সুধা পগা,
ন সাধবো ভাগবতা কথা শ্রয়াঃ

নযত্র যজ্ঞেশ কথা মহোৎসবা স্থরেশ
লোকোপি সবৈন সেব্যত্তাং ॥

মাতঃ! কলিতে হরিনাম ভিন্ন আর কোনও নাম নাই—

সত্যে ধ্যায়তে বিষ্ণুঃ ত্রেতায়াং যজতে মখৈঃ
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌতদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

চৈতন্যের মাতা এইরূপ হরিভক্তি প্রদায়ক উপদেশ শ্রবণ করিয়া সত্বরেই পুত্রের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। এই সময় প্রসিদ্ধ ন্যায়বিৎ পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি ও অদ্বিতীয় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে উপস্থিত ছিলেন, ইহাঁরা চৈতন্যের বাল সখা ও সহাধ্যায়ী। সকলেই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের শিষ্য। চৈতন্যের মতিভ্রম হইয়াছে বিবেচনা করিয়া সহাধ্যায়ীরা গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে অনুরোধ করিলেন, যেন চৈতন্য এই ভ্রান্ত মত ত্যাগ করিয়া শাস্ত্র পাঠে মনোভিনিবেশ করেন, তদনুসারে গঙ্গাদাস পণ্ডিত এক দিবস চৈতন্যকে ডাকাইয়া মিষ্টবাক্যে বলিলেন বৎস! অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভক্তিতে মোক্ষ লাভ হয় না; অতএব তুমি আরও কিছুকাল শাস্ত্রাধ্যয়ন কর! চৈতন্য শুনিয়া ঈষৎ রুষ্ট ভাবে বলিলেন, গুরো! মুক্তি শাস্ত্র পাঠ করিয়া অপবর্গের আশা কি? দেখিব নবদ্বীপে আমার ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে কে সমর্থ হয়।

"দেখি কার সাধ্য আছে এই নবদ্বীপে।
খণ্ডুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে॥
পরংব্রহ্ম বিশ্বম্ভর শব্দ মূর্ত্তি ময়।
যে শব্দেতে যে বাখানে সেই সত্য হয়॥"

[চৈতন্য ভাগবত]

চৈতন্য শিষ্য হইয়া অধ্যাপককে এমন উত্তর দিলেন কেন?

বিশেষতঃ নবদ্বীপ, পণ্ডিত প্রধান স্থান। বোধ হয় জগতের অক্ষর মালাকে তিনি মাত্র শূন্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় স্থূল মনে করিতেন। অথবা চৈতন্য দেব বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া অসাধারণ জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি নবদ্বীপের সমস্ত পণ্ডিতকে তর্কে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতেন। মহাত্মা চৈতন্য দেব এইরূপে সমস্ত ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া আটচল্লিশ বৎসর বয়সের সময় মানবলীলা সম্বরণ করেন।

পাঠক! আমরা চৈতন্যের জীবনী ও কার্য্য সম্ভবতঃ অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। চৈতন্য পূর্ণব্রহ্ম বা ঈশ্বর তাহা আমরা স্বীকার করিনা, যদিও নবদ্বীপের বিদ্যারত্ন বাবাজী বৃদ্ধকালোচিত ধর্ম্মোত্তেজনায় অধীর হইয়া তাঁহাকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি দেখিতে হইবে যে, তাঁহার ঐ স্বীকারও প্রমাণ শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। তিনি যে সমস্ত বচন পুরাণাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরা বহু অন্বেষণ করিয়াও সেই বচনগুলি ঐ ঐ পুরাণে পাইলাম না। বিদ্যারত্ন বাবাজী বোধ হয় নিজে ঐ গুলি রচনা করিয়া স্বার্থ সিদ্ধির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন, অথবা তিনি যে প্রমাণ বলে চৈতন্যের পক্ষপাতী সেই প্রমাণ গুলি ঐ ঐ পুরাণে পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, বিশেষতঃ ঐ ঐ পুরাণ গুলি যবনাধিকার সময়ে রচিত; অথবা চৈতন্যের পরে চৈতন্যের শিষ্যগণ ভাবী লোকের বিশ্বাসার্থে বচন রচনা করিয়া পুরাণে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। ভারতীয় শাস্ত্রে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মহাভারতান্তর্গত ভগবদ্গীতা যে পরবর্ত্তী লেখক কর্ত্তৃক রচিত হইয়া মহাভারতের মধ্যভাগ শোভা করিতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। এমন কি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলটীও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। আমরা বলি চৈতন্য উচ্চ শ্রেণীর সাধক, একজন প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত, তিনি ঈশ্বর বা পূর্ণ ব্রহ্ম ইহা কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না। তবে বেদান্ত মতে তিনি

পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে পারেন। কেননা বেদান্তে দুটী মত প্রচলিত আছে, পরিণামবাদ আর বিবর্ত্ত বাদ। পরিণামবাদীরা বলেন, ব্রহ্মের পরিণামে জগৎ সুতরাং সমস্তই ব্রহ্ম''। পরিণাম বাদ মতে চৈতন্য কে, পূর্ণ ব্রহ্ম বলিতে আমাদের আপত্তি নাই। যাহা হউক, শাক্ত বিদ্যারত্ন চৈতন্যের পূর্ণ ব্রহ্মত্বে বিদ্বেষী হইয়া তিনি অবতার নহেন বলিয়া যে ঘোষণা করিতেছেন তাহা যুক্তি যুক্ত নহে। যদি ন্যায় শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াও তিনি ক্ষত্রিয় তনয় কৃষ্ণকে ঈশ্বর বোধে, ক্ষত্রিয় তনয় রামচন্দ্রকে ঈশ্বর বোধে অর্চ্চনা করিতে পারেন, যদি তেত্রিশ কোটী দেবতা সাপ, মাছ, বেঙ, গাছ, পাতর, তাঁহার অর্চ্চনীয় হইতে পারে, তবে ব্রহ্মার মুখজাত শ্রেষ্ঠবর্ণ, মহা পণ্ডিত, চৈতন্যকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া অর্চ্চনা করিতে আপত্তি কেন? যদি ঘৃণনীয় জীব জন্তু ঈশ্বর রূপে আরাধনীয় হইতে পারে, তবে চৈতন্যের অপরাধ কি? আর বৈষ্ণব চূড়ামণি বিদ্যারত্ন বাবাজীকে বলি— এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম্মান্ধতা বিড়ম্বনা মাত্র। মনুষ্য ঈশ্বর; ইহা বালকেও বিশ্বাস করিতে পরাঙ্মুখ। যখন দার্শনিকগণ মূল ঈশ্বরের সত্ত্বা লইয়াই এত গোল করিয়া গিয়াছেন; তখন মনুষ্য ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি। চৈতন্য পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া, নাচে নাচুক—তিলি বেণে, নাচুক,—সুঁড়ী, নাচুক—অপবিত্র বৈরাগী, উহাদের নৃত্য শোভা পায়, উহারা নাচে বলিয়া কি বঙ্গের বিখ্যাত স্মার্থ, মহাপণ্ডিত পিতা পুত্রে নৃত্য করিবেন, কি লজ্জার কথা!

তবে চৈতন্য যে শাক্য সিংহ বা অন্য কোন ধর্ম্ম প্রচারক হইতে ন্যূন আমরা তাহাও বলি না, সমাজের দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল যে তাঁহা দ্বারা সর্ব্বত্র প্রথমে শিথিলীকৃত হয়, তাহার সন্দেহ নাই। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাভিমানী ব্রাহ্ম সম্প্রদায় যাহা সিদ্ধ করিতে অসমর্থ হইতেছেন, মহাত্মা চৈতন্য দেব আপনার পবিত্র

জীবন ও প্রকৃত আত্ম ত্যাগে তাহা সিদ্ধ করিয়াছিলেন। যদি কখনও বাঙ্গালার উন্নতি হয়, তবে তাহার মূল যে চৈতন্যের সমাজ সংস্কার তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আক্ষেপের বিষয় এই, চৈতন্যের সেই বিশ্বপ্রেমীধর্ম্ম আজ যেরূপ শোচনীয় অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলেও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। চৈতন্য-দেব মদ্য মাংস বিপ্লাবি তান্ত্রিক ব্যবহারকে যেরূপে বিদূরিত করিয়া পবিত্র প্রেম-প্রধান ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্য গোস্বা-মীরা এক্ষণে নিরন্ন বাঙ্গালীকে প্রকারান্তে ব্যভিচারী ও পথেরভিখারী করিয়া তুলিয়াছে, বৈষ্ণবগণের আর শ্রমার্জ্জিত অন্নে প্রাণ ধারণের ইচ্ছা নাই, যত প্রকার বীভৎস পাপ আছে প্রায় সমস্তই বক্রভাবে বৈষ্ণবসমাজে প্রবেশ করিয়াছে, এক্ষণে মদ্যপানের পরিবর্ত্তে ত্বরিতা, স্বদার, পরিবর্ত্তে পরদার, এবং ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধর্ম্ম বিরাজমান, আবার এই বৈষ্ণব মতের অস্থি মজ্জা লইয়া বাউল, কর্ত্তা ভজা প্রভৃতি কতক গুলি সমাজ বিপ্লাবক দল উৎপন্ন হইয়াছে। বঙ্গদেশের মধ্যে নবদ্বীপ বৈষ্ণব প্রধান স্থান, যে চৈত্যন্যের পদ রক্ষার স্থান ছিল না, সেই চৈতন্যের শিষ্যগণ এখন "দ্বিতল ত্রিতল ময় নেত্রে রম মঠে" সেবা-দাসীসহ বাস করিয়া হরিনামের পরিবর্ত্তে প্রাণারামের পন্থা অন্বেষণ করিতেছে। যদিও বাহ্য চিহ্নে ইহাদিগের ত্রিকণ্ঠী আছে, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাব আছে, কিন্তু আন্তরিক ভক্তি বিন্দু পরিমাণে আছে কি না সন্দেহ স্থল। ঐ বৈষ্ণব কুলাধমেরা এখন এমন বিলাসী যে, চল বীজন সেবী হইয়া দিনপাত এবং পুষ্প শয্যায় রজনী যাপন করিতেও কষ্ট অনুভব করে। কি দুর্ভাগ্য! কি কলঙ্কের কথা! নবদ্বীপের ন্যায় পণ্ডিত প্রধান স্থানেও এই সকল পাপাধমের আশ্রয়, আরও দুঃখের বিষয় যে আমাদিগের শীর্ষ্য স্থানীয় পণ্ডিতগণও ইহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া নিরিহ তিলী বেণে-দিগের পুরঙ্গণাগণের নিকট শ্যামকুণ্ড রাধা কুণ্ডের কবাট মুক্ত করেন।

* ছিঃ, লজ্জার কথা, কি কলঙ্কের কথা! ইহা কি পণ্ডিতগণের পক্ষে অপার কলঙ্ক নহে?

যে নবদ্বীপ বঙ্গের মস্তক, যে নবদ্বীপ রত্নপ্রসূ, আজ সেই নবদ্বীপের কি শোচনীয় অবস্থা! ইহারা এখন আর অধ্যয়ন অধ্যাপনে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক নহেন, কিন্তু পৈত্রিক উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে, ব্যবস্থায় কল্পতরু হইয়া, এই উন বিংশ শতাব্দির পূর্ণালোকেও "পাতি" দিবার জন্য লালায়িত। অথবা ফল কথা এই, এখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মাত্রেই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ নহেন, তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে যেমন হউক, পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ আছে। কিন্তু সুখের বিষয় এই, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের যে সব বাহ্য চিহ্ন থাকে, ইহাঁদিগের তাহার কিছুরই অভাব নাই। চটি জুতা, ঘাটে আহ্নিক তর্পণ "তরমুজের বোঁটাসম টিকি শোভে শিরে" আছে। কেবল ভিতরের ষোল কড়াই কাণা। নবদ্বীপ পরীক্ষকের স্থান, কাজেই অন্যত্র যাইয়া উহাঁদিগকে পরীক্ষা দিতে হয় না। কেহ শিবের ধ্যান শিখিয়াই বাণেশ্বর, কেহ বা গঙ্গা স্তব মুখস্থ করিয়াই শঙ্করাচার্য্য হইয়া ষোল আনা বিদায়ের দাওয়া করেন; কেহ বা দিগ্‌গজ পণ্ডিতের বংশধর বলিয়া বিদায় চান, না দিলে অভিসম্পাত করিবেন, পৈতা ছিড়িবেন, শেষে ঘরে গিয়ে কলা বউয়ের উপর রাগ ঝাড়িবেন। এখানকার সকল পণ্ডিতই যে এইরূপ, আমরা তাহাও বলি না, এখনও মুখোজ্জলকারী কএকটী রত্ন বঙ্গাকাশে স্তিমিতভাবে আলো দিতেছেন, কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিত যে সরস্বতীর বড় ধার ধারেন না, তাহারও বিন্দুবিসর্গ সন্দেহ নাই।